রাষ্ট্রসভা পত্রমালা : ২

আফগানিস্তানে পাশ্চিমা আগ্রাসন ও আমাদের কর্তব্য

সভার কার্যবিবরণী

# ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা

রাষ্ট্রসভা পত্রমালা : ২

# ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম

'আফগানিস্তানে পশ্চিমা আগ্রাসন ও আমাদের কর্তব্য'

সভার কার্যবিবরণী

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা

জাক লাকাঁ ইনস্টিটিউটের ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ ও
আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার ২৩ নভেম্বর ২০০১ ও ২৬ জুলাই ২০০২-র অনুষ্ঠানে
এবং 'রাষ্ট্রসভা পত্রমালা'র প্রকাশনায়
যাঁরা উপদেশ, অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের উদ্দেশে আমাদের

## কৃ ত জ্ঞ তা


অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ
অধ্যাপক অনিসুজ্জামান
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামান
অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুনর রশিদ
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
ফরহাদ মজহার
ড. স্বপন আদনান
আবদুল হক
মঈন চৌধুরী
ড. হোসেন জিল্লুর রহমান
তারেক মাসুদ
নাসির আলী মামুন
মঈনুদ্দীন খালেদ
নুরুল ইসলাম ভুঁইয়া
গোলাম কিবরিয়া
সাজ্জাদ শরিফ
বিভা চৌধুরী
ব্রাত্য রাইসু
শহিদুর রহমান
হাসানুর রশীদ
সৈকত হাবিব
নূরুল আনোয়ার
ইফতেখার উদ্দিন
সাদ্দাম হোসেন

# রাষ্ট্রসভা পত্রমালা : ২

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ ॥ ১১ আশ্বিন ১৪০৯

## প ত্র সূ চি


ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম ৭
ফরহাদ মজহার

আফগানিস্তানে ইঙ্গ মার্কিন হামলা : জালেম ও মজলুম ৩১
আহমেদ আবদুল কাদের

'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম' প্রসঙ্গে ৩৭
রেহনুমা আহমেদ

না ক্রুসেড ও না জেহাদ ৪১
সলিমুল্লাহ খান

উপস্থিত বাদ প্রতিবাদ ৫০
মেসবাহ কামাল ও অন্য ১৩ জন

পূর্ব মীমাংসা ॥ প্রবন্ধকারের উত্তর ৫৮
ফরহাদ মজহার

উত্তর মীমাংসা ॥ সভাপতির ভাষণ ৬০
আহমেদ কামাল

'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ক
নিয়ে অধিপতির ভাবনাজাল ॥ চিঠি ৬৩
খালেদা খাতুন ও অন্য ৩ জন

রাষ্ট্রসভা পত্রমালা : ২
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ ॥ ১১ আশ্বিন ১৪০৯

**প্রধান সম্পাদক**
সলিমুল্লাহ খান

**সম্পাদক**
জহিরুল ইসলাম

**সম্পাদনা সহকারী**
মাসুম আহমেদ

**সম্পাদনা বিভাগ**
মনোজ মিশ্র
রাশিদুল হাসান নাঈম
সাখাওয়াত হোসেন
তরিকুল হুদা
ফিরোজ হায়াত

**প্রচ্ছদ**
হাসান চিশতি

**কম্পোজ**
কালজয়ী কম্পিউটার
৪১ আজিজ সুপার মার্কেট, ২য় তলা, ঢাকা

**দাম : ৪০ টাকা**

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার পক্ষে ১৬/এ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলা মটর, ঢাকা ১০০০ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ফোন : ০১৮ ২৯ ৬৭ ৮৭

# পত্রশোচনা

১

'রাষ্ট্রসভা পত্রমালা'র প্রথম পত্র প্রকাশের সময় আমরা কোনো 'পত্রসূচনা' যোগ করি নাই। পরিবর্তে দ্বিতীয় পত্রের মুখে এই পত্রশোচনা। 'রাষ্ট্রসভা পত্রমালা : ১' প্রকাশ পায় গত ২৬ জুলাই। এতে ছাপা হয় সলিমুল্লাহ খানের লেখা 'ফাকানো কি জিনিস? অথবা আহমদ ছফার সুশীল সমাজ বিচার' (আহমদ ছফা স্মৃতিবক্তৃতা : ২০০২)। এই পত্রে আছে এক বছর আগে – ২৩ নভেম্বর ২০০১ – অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ। ঐ দিনই কয়েকজন শুভকামীর ভাষায় 'ঢাকার চিন্তাস্রোতে' আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা সংযোজিত হয়।

২৩ নভেম্বরের সভা ডাকা হয় আফগানিস্তানে পশ্চিমা হামলার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে জাতীয় সমাজের কর্তব্য কি তা আলোচনার জন্য। সভার শিরোনাম ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম – এই তিন পদে আটক রাখা হয় আলোচনার যাত্রাবিন্দু জ্ঞানে। সেদিনের সভায় আমাদের আমন্ত্রিত সকল বক্তা হাজির হন নাই। সৌভাগ্যক্রমে তিনজন নির্ধারিত বক্তা ছাড়াও মজলিসে আরো ১৪ জন কথা বলেন। পরে উপস্থিতদের চারজন একটি চিঠিও দেন। সলিমুল্লাহ খানের বক্তৃতা একটি দৈনিক পত্রিকায় ছাপার পর প্রায় আট-সাতটি বাদ প্রতিবাদ ছাপা হয়। দুর্ভাগ্য, আমরা যথাসময়ে সভার কার্যবিবরণী প্রচার করার সুযোগ পাই নাই।

২

তা'হলে ব্যাকুল মানুষ ভরসা নিয়ে তাকাবে কোথায়?
বিশ্বাসের সব কেন্দ্র, প্রার্থনার সব ভাষা মিথ্যা হয়ে যায়।
মানুষের আহাজারি আকাশে কী বাজে?
আকাশ আকাশে নেই, আকাশের হৃদপিণ্ডে শূন্যতা বিরাজে।

নিখিল নাস্তির মুখে দিব্যতার শিখার মতো এই কয় কথা লেখেন আহমদ ছফা জীবনের উপান্তে এসে। তারপরও মানুষ নামক এক নির্বিশেষ প্রাণীতে তাঁর বিশ্বাস টুট হয় নাই। আহমদ ছফার ধারণা মানুষ মৃত্যুর ছোবল থেকেই জীবনের পাঠ গ্রহণ করে; জলের কল্লোল থেকে কণ্ঠ ভরাট করে সংগীতে। মহামারী থেকে প্রাণ আর রোগ থেকেই আয়ু গ্রহণ করে মানুষ। মানুষ 'শোকের কায়া ছেনে' তীক্ষ্ম করে পেশী আর স্নায়ু। আহমদ ছফার মতে :

পাতালে চরণ গাথা মেঘেতে মস্তক
দুরন্ত সৃষ্টির সুখে জীবনের মহৎ স্তবক
মানুষই রচনা করে, সব ক্ষতি তুচ্ছ করে শিরদাঁড়া তুলে
মানুষ দাঁড়াবে তবু অন্তরের বলে।

রাষ্ট্রসভা পত্রমালায় আমরাও খানিক এই অন্তরের বলেই দাঁড়াই। পরাধীন দেশে এমন স্বাধীনতার গান শুনতে কি একটু বেমানান? ইতিহাসের অতীত যে কোনো যুগের চাইতে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ, বেশি দেশ একটি সাম্রাজ্যের অধীন, আজ্ঞাবহ। আফগানিস্তান এই নতুন দুঃখেরই আপাতশেষ উদাহরণ।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমের সাম্রাজ্য আজ আফগানিস্তান দখল করেছে। এর আগেও তারা সেদেশে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবার করেছেন সরাসরি নিজ হাতে সরকার গঠন। প্রশ্ন : আফগানিস্তানে আমেরিকান প্রশাসন কি এমন কোনো সমাজ বিপ্লব ঘটাতে পারবেন যা এর আগের রুশ বা ইংরেজ প্রশাসন পারেন নাই? রামমোহন রায় এবং কার্ল মার্কসের মতন বুদ্ধিমান মানুষও এক সময় ভেবেছিলেন ভারতে ইংরেজ শাসন কিছুটা হলেও এক ধরণের সমাজ বিপ্লব ঘটাবে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক জের ভারতে আজও শেষ হয় নাই। নিখিল দক্ষিণ এশিয়া এখনও উনিশ শতকের গোড়ায় রয়েছে বলেই আমাদের ভুল হয়।

গত দুইশ বছরে আফগানিস্তানে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কমপক্ষে তিনবার নেওয়া হয়। কিন্তু কোনো বারই তা ষোলো আনা ফল প্রসব করে নাই। বৃটিশ ও রুশ সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি বাফার রাষ্ট্র হিসাবে আফগান দেশ স্বাধীনতা এক রকমের বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ২০০১ সালে মনে হয় আফগানিস্তানে সত্য পরাধীনতার যুগ শুরু হয়েছে।

১৮৩৮-১৮৪২ সালের সংগ্রামে ইংরেজরা কাবুল দখল করেও হাতে রাখতে পারেন নাই। সেইদিন জাতীয় জনযুদ্ধ বা জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন দেশের ধর্মনেতারা। সশস্ত্র জনযুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজদের উৎখাত করা হয়। ১৮৭৮-১৮৮০র সংগ্রামেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু ১৮৯৩ নাগাদ আফগান সরকার খানিক ইংরেজের কাছে নত হন। ১৯১৯ সনে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বাদশাহ আমানুল্লাহ খান কিছু সংস্কারে হাত দেন। তখন ইংরেজরা ধর্মনেতাদের জেহাদকে আমানুল্লাহ বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত করেন। আমানুল্লাহর পতনের পর শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালে বৃটিশ নির্ভর রাজার শাসন কায়েম হয়। ১৯৭৩ পর্যন্ত এই বংশই আফগানিস্তানে ক্ষমতায় ছিলেন। ১৮৩৮-১৮৪২ এবং ১৮৭৮-১৮৯৩ এই দুই যুদ্ধে জেহাদ বা জাতীয় প্রতিরোধ ইংরেজ বিরোধী জনযুদ্ধের রূপ নেয়। তাই ইংরেজরা হারেন। মজার ব্যাপার ১৯১৯-১৯৩৩ এবং ১৯৭৮-১৯৯২ এই দুই পর্বের যুদ্ধে জেহাদ বা জাতীয় প্রতিরোধ ইংরেজ ও আমেরিকার পক্ষে যায়। এখন আমেরিকার বাহিনী আফগানিস্তানে আছেন। সেখানে আবার কি ১৮৩৮-১৮৪২ এর স্মৃতি জেগে উঠবে?

দ্বিতীয় জর্জ বুশ কর্তৃক ক্রুসেডের স্মৃতিচারণ এই স্মৃতির পটভূমি আরো বড় করে তুলেছে। আফগান জাতির চোখ দিয়ে দেখলে দ্বিধা দেখা দিতে পারে : মার্কিন অভিযান থেকে বাঁচার একটা পথ কি কোথাও ছিল? কিন্তু ধনতন্ত্রের ইতিহাস আর ক্রুসেডের ইতিহাস – এই দুই ভূমি থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় এই আগ্রাসন ঠেকাবার কোনো উপায় ছিল না। বিষয়টা শুধু তেলের লড়াই হিসেবে দেখলে ইতিহাসকে খুব সংকীর্ণ করে দেখার বিপদ দেখা দেয়। এই ভুলের কারণ খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর লড়াইকে মাত্র জমির লড়াই মনে করার প্রমাদে নিহিত। লড়াইয়ের এই ছবি কাল্পনিক। জেরুজালেমকে শুধু জমি মনে করা যে ভুল আফগানিস্তানকে নিছক তেলের পাইপপথ ভাবাও সেই ভুলই। লড়াইটা নিছক স্বার্থের নয়, স্বার্থপারের, প্রতীকের, মানের, নিশানের।

ইতিহাসে নিশানের ভূমিকা কী? এ নিয়ে আমাদের ভাবনা এখনও – অন্তত এই দ্বিতীয় – পরিষ্কার হয় নাই। আশা করি আমাদের জাতীয় সমাজে এই প্রশ্নের আলোচনা থেমে থাকবে না।

# ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম

ফরহাদ মজহার*

## ১। কয়েকটি পদ্ধতিগত প্রশ্ন

লড়াকু আহমদ ছফা আর কাছে নেই ; কিন্তু তার নাম ধারণ করে বানানো 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'-র প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠান 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম'। আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও হিংসা-যুদ্ধ এবং আমাদের কর্তব্য বিষয়ে এই সভা। আরও বড়ো পরিসরে বললে দুনিয়া জুড়ে পুঁজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি, জনগোষ্ঠি, রাষ্ট্র কিম্বা নারী ও পুরুষের মধ্যে যে লড়াই চলছে তাকে শ্রেণীসংগ্রামের দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করা। লড়াইয়ের বাস্তব রূপ যেমন আছে, তেমনি তার বাস্তব ভাষাও আছে, কেতাবি ভাষা নয়। স্থানকালপাত্র বা ইতিহাস ভেদে আবার তার ফারাকও কম নয়। সংগ্রামের ভাষা সবসময় কেতাবি কায়দায় ব্যক্ত হয় না। তাহলে শ্রেণীসংগ্রামের দিক থেকে বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই অনুধাবন মানে স্থানকালপাত্র ও ইতিহাস ভেদে তার বিভিন্ন রূপ ও ভাষার মধ্যে ঐক্যের জায়গাটা ধরতে শেখা। কেন? পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুনিয়ার নিপীড়িত শ্রেণী, নারীপুরুষ, জনগোষ্ঠি, জাতি বা সাধারণ জনগণকে ক্রমাগত বিভক্ত, পরস্পর থেকে আলাদা এবং পরস্পরকে দুশমনে পরিণত করে। এই ক্রমাগত বিভক্তি ও পরস্পরের দুশমন বানানোর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য শ্রেণীসংগ্রামের নানান ঐতিহাসিক রূপের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান এই সময়ে রাজনৈতিকভাবে অতিশয় জরুরি। এই কাজটা আমরা করতে চাই বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনীতিকে শক্তিশালী ও বিকশিত করবার দরকারে। বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্দার হিশাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে ও অন্যত্র যে সাম্রাজ্যবাদী হামলা চলছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

শ্রেণীসংগ্রাম দিয়ে ইতিহাস বিচারের প্রস্তাব ও চর্চার কথা তো বহুকাল থেকেই আমরা জানি। মার্কসেরও আগের। পুরনো। এমনকি এর অনিবার্য ফলাফল কী হয় সেই সম্পর্কে তাঁর নিজের ভাষ্য ছাড়া ধারণাটা মার্কসের নিজেরও নয়, মার্কস সেটা

* কবি, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি, পাক্ষিক *চিন্তা*, শ্যামলী, ঢাকা।

নিজেই আমাদের বলে রেখেছেন। পুঁজিতান্ত্রিক (বিশ্ব) ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সর্বস্ব হারায়, বেঁচে থাকার জন্য শুধু নিজের গতরের শক্তি বিক্রি করার সম্পর্কটুকু ছাড়া। শ্রেণীসংগ্রামের ফলাফল হয়ে ওঠে এই শ্রেণী 'একনায়কতন্ত্র' – তাঁর এই প্রস্তাবটি মৌলিক। কিন্তু এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা করবার মওকা পাব না।

শ্রেণীসংগ্রাম অনেকের কাছে হয়তো সেকেলে। অতিশয় ব্যবহারে ব্যবহারে জীবনানন্দের প্রতীকী জবানে 'শূকরের মাংস' হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। বাংলাদেশে যার যেমন খেয়াল তেমন খোশহাল ব্যবহারে এই রকম মুশকিল হয়েছে। ধারণাটি ও তার চর্চার বিরুদ্ধে নানান কিসিমের মতাদর্শিক লড়াই তো আছেই। ফলে ধারণাটির উপযোগিতা কাজে খাটিয়ে দেখানোর দায় আমাদের কাঁধে নতুন করে চেপে বসেছে। আগে শ্রেণীসংগ্রামীদের বুদ্ধিবৃত্তিক জিন্দেগি আরামের ছিল। শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কী বলা হচ্ছে সকলেই যেন বুঝে যেতো। এতোই আয়নার মতো ফর্শা ছিল ধারণাটি। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নও নেই, সেই চীনও নেই। লেনিনের মূর্তি টেনে ভেঙে নামানো হয়েছে। জার্মানির ট্রিয়ার শহরে গিয়ে কার্ল মার্কসের বাড়ির কথা শুধালে রাস্তায় অনেকে হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় 'এ যাবতকালের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস' – এই আপ্তবাক্য হাঁকলে ঈমান আনবার লোকের অভাব হোত না। যে আয়নায় একসময় সহজেই মুখ দেখা গিয়েছিল সেই আয়নার পেছনের পারদ কবেই ক্ষয়ে গিয়েছে, কোন প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না। অতএব কাজ বেড়েছে। এখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাকে সপ্রাণ করে তোলা এবং কাজে খাটিয়ে তার উপযোগিতা প্রদর্শন করে নানান সংশয়, প্রশ্ন ও কৈফিয়ত মেটাবার দায় এড়ানো সম্ভব নয়।

এখন আমরা খুবই সুনির্দিষ্ট একটি বিষয় ধরে আলোচনা করব। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের ঘটনা এবং তার ছুতোয় আফগানিস্তানে ইঙ্গ মার্কিন সামরিক হামলা। আফগান জনগণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিন হামলার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে নমুনা আমরা দেখছি, তার বিচার ও কর্তব্য নির্ধারণ নিয়ে কিছু কথা বলব। সেটা করব শ্রেণীসংগ্রামের জায়গায় দাঁড়িয়ে 'জেহাদ' ও 'ক্রুসেড' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন পেশ করবার তাগিদে।

আমরা কারা? যারা মানি যে, সমাজে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে মানুষে-মানুষে ভেদ থাকে। সব মানুষ প্রকৃতিগতভাবে বা দেখতে একরকমও যদি ভাবি তবু তাদের সামাজিক রূপের মধ্যে ধনী গরিব, মনিব মজুর পার্থক্য ও বিরোধ থাকে। আমরা বলি শ্রেণীভেদ। তার মানে 'মানুষ' নামক কোন বিমূর্ত জন্তু নেই। আমরা চাই বা না চাই শ্রেণীভেদের কারণে সমাজে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম চলে। চলছে। এখন বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্ফীতি, পুঞ্জিভবন ও বিস্তৃতির কারণে বিশ্বব্যাপী শ্রেণীসংগ্রামেরও বিস্তৃতি ঘটেছে এবং তার চরিত্রও ক্রমে ক্রমে বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে। এই প্রাথমিক চিন্তা কাঠামোর জায়গায় দাঁড়িয়ে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা – যাকে মানুষের একমাত্র ও শেষ সভ্যতা বলে হামেশা বর্ণবাদী প্রচারণা চালানো হয় – তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চালানো ছাড়া দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বেঁচে

থাকার উপায় নেই। মানবেতিহাস অনন্ত সম্ভাবনাময়। সেই অনন্ত সম্ভাবনার দরোজাও খোলা যাবে না। এই ন্যূনতম কথাগুলো যাঁরা মানেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে সেইভাবেই শ্রেণীসংগ্রামের জায়গা থেকে গড়ে তোলেন, তাঁদেরকেই মোটা দাগে সকর্মক রাজনৈতিক-দার্শনিক অর্থে এখানে 'আমরা' বলে শনাক্ত করছি।

এই 'আমরা'-র কোন 'তোমরা' নেই। কার্ল মার্কস একটা দুর্ধর্ষ কথা বলে গিয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর জয় মানে শ্রেণী হিশাবে তার জয় নয়। কারণ, তার জয়ের মধ্য দিয়ে যেহেতু সকল শ্রেণীভেদের অবসান ঘটে, শ্রেণীভেদমূলক সম্পর্কাদি যেহেতু নির্মূল হয়ে যায় – অর্থাৎ বিশ্বব্যবস্থা মনিব/মজুর বা পুঁজিপতি/শ্রমিক ইত্যাদি তৈরি করে সেই ব্যবস্থাটাই খোদ ভাগে, অতএব শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য কেবল মনিব বা পুঁজিপতি শ্রেণী নয়। সর্বহারা নিজেও নিজের শ্রেণীসত্তার বিরুদ্ধে লড়ে। কারণ লড়াইয়ের ফলাফল হিশাবে শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণী তো নিজেরই বিলয় ঘটায়। লড়াইটা তাহলে শুধু 'অপর' শ্রেণীর বিরুদ্ধে – শুধু সামন্ত, বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। শ্রমিক শ্রেণীর 'আমার'/'তোমার' ভেদ নেই। কারণ লড়াইটা আসলে তার নিজ শ্রেণীর বিলয় সাধনের তাগিদেই। পোস্টমর্ডানিজম/পোস্ট কলোনিয়ালিজম নামে যেসব কথাবার্তা কানে আসে, যে সবের ভালোমন্দ যাঁরা হজম করেন, তাঁদের জন্য শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত এই কথাগুলোকে পুরনো মনে হতে পারে বলে আপাতত নোক্তা দিয়ে রাখলাম।

কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম কংক্রিট রাজনৈতিক অর্থে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বাইরের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই হিশাবে হাজির হয়। শ্রমিক শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক শ্রেণীশত্রু থাকে। আছে। শত্রুমিত্র নির্ধারণের মধ্য দিয়েই শ্রেণীসংগ্রাম রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করে। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় নিপীড়িত শ্রেণী তার শ্রেণী দুশমন ঠিক মতো শনাক্ত করতে পারছে কিনা তার মধ্য দিয়ে তার নিজের চরিত্রও প্রকাশিত হয়। লড়াইটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কোন ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম বা গায়ের চামড়ার পার্থক্যথাকা জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে নয়। পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের লড়াই নয়। ধনীদেশগুলোর বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রাম নয়। ইহুদি খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই তো নয়ই। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে এই ধরনের রূপ পরিগ্রহণ করে বলেই বাস্তবতা আমাদের ভাষার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। কী করে ভাষার ঐতিহাসিকতার অন্দর মহলে আমরা তাকাবো এই প্রবন্ধে সেই পদ্ধতিগত সমস্যাটাই মোকাবিলার চেষ্টা আছে।

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভায় আমরা যখন 'পশ্চিমা আগ্রাসন'-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা বলছি তখন 'পশ্চিমা' কথাটিকে তার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি দ্বারা শনাক্ত করেই বুঝতে হবে, কোনো শাশ্বত বা অনন্তকালীন ধারণা হিশাবে নয়। ঠিক তেমনি 'জেহাদ' বা 'ক্রুসেড' কথাগুলোকেও তার কংক্রিট ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি দিয়েই মালুম করা জরুরি। নিছকই মুসলমানদের আর খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ হিশাবে বুঝলে বিসমিল্লাতেই আমরা গলদ করবো। সাবধান।

আরেকটি ছোট কিন্তু দরকারি কথা। 'মানবেতিহাসের অনন্ত সম্ভাবনা' কথাটিকেও হাওয়াই আওয়াজ ভাববার কারণ নেই। কৃৎকৌশলের বৈপ্লবিক ও নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং মানুষের জ্ঞান, জীবনযাপন বা ভাবনার দিগন্তে পুঁজি নিত্যনতুন যে রূপান্তর ঘটাচ্ছে, তার মধ্যেও মানুষের অসাধারণ সম্ভাবনা আমরা টের পাই। ভবিষ্যতকে এখনই এখনকার বাস্তবতার মধ্যেই অন্বেষণ করতে হবে, কল্পজগতে নয়।

মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস তার প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা বলে একটা ইঙ্গিত মার্কস দিয়েছিলেন। সেই প্রাকৃতিকতার সূত্র ধরে অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে তার শ্রেণীভেদ ও চেতনা নিয়ে কথাগুলো বলা হল। কিন্তু মানুষ তো কেবল অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নয়। প্রকৃতিগতভাবে যেখানে দেখতে এক রকমও নয়। প্রকৃতিজগতের সঙ্গে তার বৈষয়িক বা বস্তুগত সম্পর্কও এক রকম নয়। নারী সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, কিন্তু পুরুষের পেটে বোমা মারলেও সেই কর্মটি ঘটবে না। বনবাসী, আদিবাসী বা কৃষক জনগোষ্ঠির সম্পর্কও প্রকৃতির সঙ্গে শ্রমিকের মতো নয়। তখন? নারী/পুরুষ, বাঙালি/আদিবাসী, কিম্বা সাদা/কালো/বাদামি মানুষ, ইত্যাদির কথা উঠলে আমাদের সাবধানে ভাবতে হয়। তখন প্রথাগত অর্থে শ্রেণীপার্থক্যের কথাকে আমরা শুধুই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে বিচার করলে ভুল করব। আরও নানান কিসিমের ভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

শ্রমিক বা নিপীড়ত শ্রেণীর চিন্তাকাঠামোর মধ্যে সজ্ঞানে গড়ে ওঠা সংগ্রামগুলোর বাইরে নারী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন এই কালে সুবিশাল অবদান রেখেছে। সেটা মনে রাখতে হবে। দুটো আন্দোলনই আমাদের কালে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু যে তর্ক এখনো চলছে, সেটা হল – কখন কোথায় কিভাবে প্রকৃতিগত পার্থক্য আর্থ-সামাজিক পার্থক্যের নিয়ন্তা হয়ে ওঠে, কিম্বা আর্থ-সামাজিক পার্থক্যই প্রকৃতিগত পার্থক্যের নিয়ন্তা হয়। বিয়েশাদি কাবিননামা করে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যের দ্বারা নির্ণীত ভূমিকা মেনে সন্তান 'জন্ম' দেওয়া আর টাকার বিনিময়ে জরায়ু ভাড়া নিয়ে কিম্বা টেস্ট টিউবে সন্তান 'উৎপাদন' কি এক জিনিস? দুটো ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা ক্রিয়াশীল। প্রশ্ন হল – এই কালে পুঁজিতন্ত্রই কি পুরুষতন্ত্রের চরিত্র নির্ণয় করে, নাকি উল্টা? এই প্রশ্নগুলো বিপ্লবী রাজনীতির আভ্যন্তরীণ তর্ক এবং সেটা চালিয়ে যাওয়া অতিশয় জরুরি। আমরা কার্ল মার্কসের অনুসারী থেকে মেনে নেব যে, পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক আর সকল সম্পর্ক হয় ধ্বংস করে, কিম্বা তার আমূল রূপান্তর ঘটায়। তখন পুরুষতন্ত্র, আদিবাসী প্রশ্ন বা পরিবেশের সম্পর্ককে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের অভ্যন্তর থেকে দেখাই পদ্ধতিগত ভাবে সঠিক। অতএব পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের গতিপ্রক্রিয়ার মধ্যে নারীপুরুষের সম্পর্ক ও ক্ষমতার প্রশ্নটিকে অনুধাবন করা দরকার।

কিন্তু নারী ও পুরুষের সংগ্রাম, আদিবাসীদের সংগ্রাম, এমনকি কৃষকদের সংগ্রামকেও পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব হিশাবে দেখা কিম্বা শ্রেণীসংগ্রাম মাত্রই পুরুষের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি বা শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলকেই বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে

নেওয়া – কেচ্ছাগুলো বেশ ম্লান হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবী রাজনীতিকে নারী, আদিবাসী, বনবাসী, কৃষি ও কৃষিসভ্যতার প্রশ্নকে তার প্রাপ্য তাৎপর্য দান করে যথাযথভাবে ভাববার তাকত অর্জন করতে হবে।

শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর লড়াইকে এই নিবন্ধে প্রধান গণ্য করে আলোচনা করলেও এই দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। এই সকল প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রেও বিপ্লবী রাজনীতি যথাসম্ভব নিজেদের দরোজাজানালা খুলে রেখে নির্ভয়ে খোলা হাওয়া আসতে দেয় – এটাই নারী, আদিবাসী, পরিবেশ ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বৈপ্লবিক মৈত্রীর প্রাথমিক পদক্ষেপ। এখানে সেই দিকগুলো নিয়েই আমরা এখন কথা বলব যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নটাই মুখ্য। এই আলোচনা সভা ঘোষণার পর 'শ্রেণীসংগ্রাম' কথাটি দেখে অনেকেই যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই ধরনের দরকারি পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলেছেন বলে নিবন্ধের শিরোনামে কেন অন্য সংগ্রামের কথা নেই, তার একটা কৈফিয়ত আপাতত দিয়ে রাখলাম। বলাবাহুল্য, আলোচনা যদি সেই সকল বিতর্কের দিকে যায় তাহলে আরও কথা বলা যাবে।

এবার পদ্ধতিগত প্রশ্নের আরেকটি পয়েন্ট। মানুষকে বাইরে থেকে একই রকম দেখতে মনে হলেও ভেতরে সে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পার্থক্যের কারণে নিজেকে একটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে কল্পনা করে, ভাবতে অভ্যস্ত হয় এবং তাকেই বাস্তব বলে জ্ঞান করে। শ্রেণীসংগ্রামের জায়গা থেকে আত্মপরিচয়ের এই কাল্পনিক নির্মাণ কিন্তু ইতিহাসের সক্রিয় উপাদান। একে বিচারের সঠিক পদ্ধতি কি? শ্রেণীসংগ্রাম দিয়ে গোষ্ঠি, জাতি, রাষ্ট্রচেতনা ও লিঙ্গ সম্পর্কের বিচারের সরলীকরণ সম্পর্কেও সাবধান থাকা জরুরি। কিন্তু এই পদ্ধতিগত প্রশ্নগুলো এখানে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় নয়।

## ২। শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা

বন্ধু ছফা আমাদের জন্য যে প্রেরণা রেখে গেছে তার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ বুদ্ধিবৃত্তিক সাহস। নির্ভয়ে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্ন তোলা। এটা পরিষ্কার যে আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলছে। কিন্তু এতোটুকুই বোঝাটাই কি বিপ্লবী রাজনীতির জন্য যথেষ্ট? যদি সত্যি সত্যি একে আমরা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বলে গণ্য করে থাকি এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হিশাবেই রুখে দাঁড়ানো সঠিক মনে করি, তাহলে এই যুদ্ধে আফগানিস্তানের জনগণের পক্ষে লড়বার জন্য কোন বিপ্লবীকে তো আমরা সরাসরি শামিল হতে দেখি না। সেটা তালেবানদের সমর্থন করা হয়ে যায় বলে? বাংলাদেশে বামপন্থীরা রাস্তায় নেমেছেন, সেই গৌরবটুকু তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ঘৃণাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাবার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির কাজ করবার শর্ত অনুসন্ধানের কোন প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি নি। আদৌ কি এটা করা উচিত? সেটাও তো প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদকে ইসলামী মতাদর্শ দিয়ে

যারা প্রতিরোধের কথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তার, আলাপ আলোচনার বা কাজের কি কোনই সুযোগ নেই?

তালেবান বা যে কোন ইসলামপন্থী দল সম্পর্কে এতো ঘৃণা, শংকা, ভীতির কারণ কী? বাংলাদেশের একাত্তর সালের ইতিহাস একটা কারণ অবশ্যই এবং তাকে যথারীতি মনে রাখা দরকার। কিন্তু তালেবানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ষোল আনা না হোক, সাড়ে আট আনা কি পশ্চিমা প্রপাগাণ্ডার ফল নয়? বিশেষত 'আধুনিকতা', 'প্রগতি', কিম্বা সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার কি একটা বড়ো কারণ নয়? যে 'সভ্যতা'-কে আমরা সভ্যতা জ্ঞান করি আসলেই কি সেটা 'সভ্য'? তাহলে উন্নত সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো আসলে কি? যুদ্ধ, হত্যা ও বিপুল সমরাস্ত্রের ভার ছাড়া যে সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না, মুনাফা উৎপাদনই শুধু নয়, নিত্যদিন সারা দুনিয়ায় অনাহার, মহামারী এবং ন্যূনতম বেঁচে থাকার শর্তসমূহের ক্ষয় ঘটানোই যে সভ্যতার ধর্ম, তাকে আমরা প্রতিদিন মেনে নিচ্ছি কোন যুক্তিতে? তালেবান কী জিনিস আমরা কি তা সত্যি সত্যিই জানি? নাকি সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রপাগাণ্ডাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছি? ধর্ম কী জিনিস, ইসলাম কী, কিম্বা অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস ও মতাদর্শটাই বা কী? এই সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ থাকাই পছন্দ করি। এটাই আমাদের অধিকাংশের কাছে 'প্রগতিশীলতা'। অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো আমাদের আছে। আমরা নির্ভয়ে প্রশ্নগুলো তুলতে চাই। 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'-য় আশা করি ক্রমে ক্রমে সেই সুযোগ আমরা করে নিতে পারবো।

সাধারণভাবে এই আকুতি আমাদের অনেকের মধ্যে আছে যে – ভুক্তভোগী খেটে খাওয়া শ্রেণী (শ্রমিক ও কৃষক) এবং অন্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর লড়াইকে আমরা কী ভাবে শনাক্ত করবো, বুঝবো, ব্যাখ্যা করবো এবং তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেদের রাজনীতি ও সংস্কৃতি কিম্বা তত্ত্ব ও তৎপরতার সঙ্গতি বিধান করবো তার সার্বক্ষণিক অনুসন্ধান দরকার। কিন্তু একটা দিক বিস্ময়করভাবে আমাদের এন্টেনার বাইরে থাকে। নিপীড়িত শ্রেণী নিশ্চয়ই সদা সর্বদা কার্ল মার্কস, লেনিন বা মাও জে দংয়ের ভাষায় কথা বলে না। অর্থাৎ মার্কস লেনিনের অনুসারী বা কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামের ভাষায় সকলকেই কথা বলতে হবে এ কেমন আবদার? মার্কসের নামে সংগ্রাম হলেই কি সেটা শ্রেণীসংগ্রাম হয়, নাকি যারা মার্কসের নাম শোনে নি তারা যদি আল্লাহর পথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে ও অকাতরে প্রাণ দেয়, গরিবের পক্ষে ধনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় – সেটাও শ্রেণীসংগ্রামের একটা রূপ। আমাদের চোখে সেটা আদর্শ নয়। কারণ আমরা পরলোকের জন্য লড়ি না, লড়ি ইহলোকের জন্য। ঠিক আছে। কিন্তু লড়াইটা তো ইহলোকেই হচ্ছে, পরলোকে নয়। তাহলে সেটা শ্রেণীসংগ্রাম নয় অস্বীকার করি কী করে? খ্রিস্টীয় চার্চ ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় নিপীড়িত মানুষ ও জনগোষ্ঠির পাশে লড়েছে। ঐ লড়াই থেকে লিবারেশন থিওলজি নামে একটি মতাদর্শিক ধারাও গড়ে উঠেছে। সেটা কি শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে।

তাহলে প্রশ্ন হল – শ্রেণীসংগ্রাম দেশকালপাত্র ভেদে যে ভাষা ও তৎপরতা তৈরি করে, তাকে বোঝার জন্য বিপ্লবী জ্ঞান, সংস্কৃতি ও তৎপরতার প্রস্তুতি কতোটুকু? নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠি কখনো ধর্ম, কখনো ভক্তি, কখনো হিংসা, কখনো অহিংসা, কখনো শান্তি কিম্বা কখনো নৈরাজ্য ইত্যাদি নানান ভাষায় কথা বলে। কখনো ইসলামের ভাষায়, কখনো হিন্দু, কখনো বৌদ্ধ, কখনও খ্রিস্টান ইত্যাদি নানান ধর্মের ভাষায় কথা বলে, ঠিক যেমন ধর্ম নিপীড়িত শ্রেণীর নিপীড়নকে বৈধতা দেবার ভাষাতেও কথা কয়। ধর্ম মাত্রই 'নিপীড়নমূলক' এই থিসিস যে মার্কস, লেনিন বা এঙ্গেলসের নয় সেটা 'মোকাবিলা' নামে একটি দীর্ঘ রচনায় আমি আলোচনা করেছি।

এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু আমাদের থাকা উচিত যে নিপীড়িত শ্রেণী বা জাতি মাত্রই নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নয়। নাকি শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা একটাই? যে ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের প্রকাশ করে ও পরস্পরের সঙ্গে লড়ে, সেই ভাষা তাহলে আমরা বুঝব কেমন করে? নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠি যে ভাষায় স্থানকালপাত্র ভেদে কথা বলে, সেই ভাষা কি আমরা বুঝতে সক্ষম? কাজের দিক থেকে আরও গুরুতর প্রশ্ন হল – যদি নিপীড়িত শ্রেণীর ভাষা এবং নিজেদের আত্মপরিচয়বোধ বা শ্রেণীচেতনায় এতো ভেদ ও বৈচিত্র্য থাকে তাহলে বিপ্লবী রাজনীতির দিক থেকে তাদের রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার নীতি ও কৌশল কী হবে? নাকি কখনই সেটা সম্ভব নয়। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' – কথাটা কি তাহলে হাওয়াই আওয়াজ হয়ে থাকবে?

'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'-র উদ্দেশ্য আগে থেকেই তৈয়ারি প্রশ্ন তোলা বা ছকবাঁধা উত্তর পেশ করা নয়। প্রথাগত চিন্তাকে প্রশ্নসংকুল করে তোলা প্রথম কাজ। এই প্রেরণায় এখানে আমারও চেষ্টা হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যথাসাধ্য আন্তরিকতা এবং সাহসের সঙ্গে তোলা। অবিলম্বে উত্তর পেশ করা নয়। প্রশ্নটা কী সেটা একবার স্পষ্ট হলে উত্তর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। জ্ঞানচর্চা ও বিপ্লবী রাজনীতির এটাই তো পথ।

## ৩। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মের ভূমিকা

একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে 'লা-মজহাবি', 'ফরায়জি' বা 'ওয়াহাবি'-দের ইতিহাস আমরা ভুলে গিয়েছি, কিম্বা জানা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি না। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ইতিহাস কেচ্ছা আকারে আমাদের কানে আসে, কিন্তু ইতিহাস আকারে আসে না। আফটার অল এ-গুলো মুসলমানদের লড়াই এবং তা সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। এটাই প্রথাগত ধারণা। ঠিক তেমনি 'তালেবান' নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের – বিশেষত মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের – মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব জাগে। তালেবান মাত্রই ঘৃণার যোগ্য। মধ্যযুগীয়, বর্বর ও হিংস্র। পশ্চিমা গণমাধ্যম ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে, সেটাই আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে গ্রহণ করি। জন্মসূত্রে আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মেছি বলে অনেকে হয়তো লজ্জাও বোধ করেন। যাঁরা অতোটা হীনমন্যতায়

ভোগেন না কিন্তু নিজেদের সভ্য ও আলোকিত বোধ করেন, তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের জঙ্গী রূপকে – বিশেষত পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াকু রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে তাঁদের দারুণ ভয়। ইসলাম যেহেতু পশ্চিমা সভ্যতা বা সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সমার্থক নয়, অতএব পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলামের একটা সুশীল ব্যাখ্যাও তাঁরা খাড়া করেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা যতোই হুংকার করি না কেন, নিপীড়িত শ্রেণী নানান কায়দায় নানান রূপে সেই সংগ্রাম করে। কিন্তু তাকে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে আমরা নারাজ। নিশ্চয়ই নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠি কার্ল মার্কস বা লেনিনকে গুরু গণ্য করতে বাধ্য নয়। তাহলে তাদের সংগ্রাম কি তাদের শ্রেণীর সংগ্রাম হবে না? নবী মুহম্মদ অনেকের লড়াকু আদর্শের নেতা হতেই পারেন। বিচারটা হবে তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য বা চরিত্রটা কেমন? জার্মানির কৃষক যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কী করে নিপীড়িত শ্রেণী ধর্মকে তাদের লড়াইয়ের মতাদর্শ আকারে গ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গোড়াতেও ধর্মের ভূমিকা আছে। আল্লাহর চোখে সকলে সমান, অতএব মানুষের মধ্যে রাজা-প্রজা বা সামন্ত ও শাসিতের ভেদ নাই – এই ধারণার উৎপত্তি প্রথমে ধর্মতত্ত্বে। চার্চের বিরুদ্ধে লুথারের লড়াই – যার ফলে রাষ্ট্র থেকে চার্চ বাহ্যিক অর্থে আলাদা হয়ে গিয়েছে – সেখানেও ধর্মই প্রেরণা। সেটা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আমরা মানতে রাজি, এমনকি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা সেটা মানতে রাজি নই। কেন এই অবস্থা তারও নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা দরকার। কেন ইসলাম বা বা মুসলমানদের সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্ব এবং 'আধুনিক' মানুষ এমন একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে যার ফলে স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য বলেই অনেকের কাছে মনে হয়। আসলেই ইসলাম কি সভ্যতার শত্রু? কার সভ্যতা? আর সভ্যতা ব্যাপারটাই বা আসলে কি?

'তালেবান'দের আমরা নিছকই মধ্যযুগীয়, বর্বর ও সভ্যতার দুশমন গণ্য করতে শিখেছি। আমরা যারা অতি প্রগতিশীল তারা জানি যে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক বাহিনী উচ্ছেদের জন্য ওসামা বিন লাদেন ও তালেবান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর বিশদ ভূমিকা আমাদের জানা। এই জানার বরাতে আমরা বলি, যেহেতু আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অতএব তাদের সৃষ্ট তালেবানদেরও বিরোধী। মার্কিনীদের তৈয়ারি হয়েও ওসামা বিন লাদেন ও তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছে কেন? প্রাণ দিচ্ছে কেন অকাতরে? সেই প্রশ্ন কিন্তু তুলি না। উঠলেও সেটা বিস্ময়কর ভাবে চেপে যাই। এই ধরনের বহু যুক্তি ও কুযুক্তি, আবেগ ও ঘৃণা, নানাবিধ হীনমন্যতা এবং দিশাহারের মধ্যে আমরা আছি।

তালেবানরা যখন বুদ্ধমূর্তি ভাঙল, তখন তাদের অসভ্য ও বর্বর বলে সারা পৃথিবীতে রব উঠল। তখনও আহমদ ছফা জীবিত। যখন আফগানিস্তানের শিশুরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, তখন তালেবানরা মানবিক সহায়তা চেয়েছিল 'সভ্য' দুনিয়ার

কাছে। 'সভ্য' দুনিয়া শিশুদের অনাহার, অপুষ্টি ও মৃত্যু রোধের জন্য এগিয়ে এলো না। কিন্তু বুদ্ধের মূর্তি রক্ষার জন্য কাড়ি কাড়ি ডলার নিয়ে হাজির হলো। তালেবানরা বলল – আমরা অন্তত কিছুটা অর্থ শিশুদের জন্য ব্যয় করি। 'সভ্য' দুনিয়া রাজি হল না। ওটা নাকি মৃত মূর্তির জন্যই ব্যয় হবে, জীবিত শিশুদের জন্য নয়। তালেবানরা তখন মূর্তি ভেঙে দিল। চতুর্দিকে মূর্তিবাদী সভ্যতার জয়জয়কার শুরু হল এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে বর্ষিত হল ঘৃণা। কেউই কিন্তু ব্যাপারটা আর খতিয়ে দেখল না। 'সভ্যতা'রই জয় হল। 'অসভ্য' ও 'বর্বর'দের ওপর নির্বিচারে বোমা মারা এবং নারী ও শিশুদের ধ্বংস করাসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতো অবিশ্বাস্য ও নির্মম ঘটনা আর ঘটে নি। তালেবানদের সন্ত্রাসী ও বর্বর প্রমাণ করে অভাবনীয় মানবিক সংকট সৃষ্টির যুক্তি ও বৈধতা তৈরি করা হল। এই ভাবেই। ধীরে ধীরে। অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকি শিশুদের মৃত্যু এবং ইরাকি জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশা 'সভ্যতা'র কলিজায় কোন দয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। এখন আমাদের চোখের সামনেই আমরা আফগান জনগণের ওপর নারকীয় বোমাবর্ষণ লক্ষ্য করলাম। এই হচ্ছে বিশ্ব-সভ্যতা। যাকে রক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধের দিকে তাকালে আমরা বুঝব ক্রমশ যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে ও মেরুকরণও তীব্র হচ্ছে। জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার ঠিকই বলেছেন, এই যুদ্ধ ক্রুসেডের মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বুদ্ধমূর্তি ভাঙার পক্ষে তালেবানদের যুক্তি সম্পর্কে আহমদ ছফা আমাকে প্রথমে অবহিত করেন এবং 'সভ্যতা' রক্ষার জন্য তালেবানদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে বাংলাদেশে যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিতামাশা করেন। পরে এ সম্পর্কে দুজনেই আরও খোঁজখবর নেই এবং পশ্চিমা প্রপাগান্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে এই দেশের জনগণের জন্য সঠিক অবস্থান অনুসন্ধানের তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু এই কাজটি হবার আগেই ছফা চলে গেলেন। এই সম্পর্কে ছফার সঙ্গে আমি ছাড়াও আরও অনেকেরই কথা হয়েছে নিশ্চয়ই।

## ৪। মূর্তি বনাম জীবন্ত শিশু

আহমদ ছফা 'আধুনিক সভ্যতা'-র সমালোচক ছিলেন সত্যি, কিন্তু বিদ্যমান দিগন্ত বা মূল জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি বড়ো ধরনের কোন সন্দেহ তাঁর ছিল না। আধুনিকতা বা এই যুগের অগ্রগামিতা তিনি মানতেন। 'প্রগতি'র ধারণার মধ্যেই যে একটা মুশকিল আছে, এটা তিনি সম্ভবত টের পেতেন ; কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতা ছাড়া বিষয়টি খোলাখুলি লিখিত ভাবে মোকাবিলা করেছেন বলে আমার চোখে পড়েনি। কোন সভ্যতা বা জীবনযাপন পদ্ধতি 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' বা 'সভ্য' আর কোন্ জীবনযাপন 'মধ্যযুগীয়', 'পশ্চাতপদ' বা 'বর্বর'? কে, কীভাবে, কোন্ মানদণ্ড দিয়ে সেটা ঠিক করে? এই প্রশ্ন তাঁরও ছিল। তবুও তিনি 'রেনেসাঁ'পন্থী ছিলেন। সংস্কার ও জাগরণে তাঁর আস্থা ছিল। বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ছিল। কিন্তু সশস্ত্রতা বা রক্তপাত সহজে মেনে নিতে পারতেন না। বাংলাদেশের

মুসলমান জনগোষ্ঠিকে 'আলোকিত' পথে নেবার একটা কর্তব্য রয়ে গিয়েছে, এটা মানতেন। তাদের 'মধ্যযুগীয়' ধ্যানধারণা ও পশ্চাতপদতা থেকে তাদের 'যুগোপযোগী' করে গড়ে তোলাটা তাঁর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্তব্য – এই জ্ঞান তাঁর ছিল। কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও তালেবানদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকমই ছিল। তাঁর বরাতে এর বেশি কিছু বলার এখন দরকার নেই।

কিন্তু বুদ্ধমূর্তি ভাঙার বিষয়টা তাঁকে 'সভ্যতা' সম্পর্কে দারুণ ভাবিয়েছে। তেমনি হয়তো আরও অনেককেও। মূর্তি বনাম জীবন্ত শিশু। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দুনিয়ায় লড়াইটা কার সঙ্গে কার সেই প্রশ্নের উত্তর বিমূর্ত কায়দায় তুলতে ছফা নারাজ ছিলেন। ঝগড়াটা কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামের সঙ্গে কেন? পশ্চিমা বিশ্ব ইহুদিবাদী ইসরাইলী রাষ্ট্রকে মানতে পারে কিন্তু ফিলিস্তিনী জনগণের জন্য স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না কেন? সেটাও যদি মেনে নেওয়া যায় তবুই দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় আমরা দেখলাম গুলতি দিয়ে যে ফিলিস্তিনী কিশোর ইসরাইলী ট্যাংকের বিরুদ্ধে লড়ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে 'সন্ত্রাসী' কর্মকাণ্ড। মুসলমান কিশোর মাত্রই 'সন্ত্রাসী' হয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে জেহাদ করবার জন্য প্রশিক্ষিত হচেছ। মাদ্রাসা মানেই জেহাদি মুসলমান তৈরির কারখানা। অসভ্যতা, বর্বরতা ও হিংস্রতা শেখাবার জন্যই নাকি মাদ্রাসা। আর 'আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষা'য় শিক্ষিতরা ও পশ্চিমা সভ্যতায় বিশ্বাসীরা সুশীল। তাঁরা সন্ত্রাস করেন না। যুদ্ধ করেন না। কাউকে মারেন না। তাহলে দুনিয়ায় এই যে বোমাবাজি, বিপুল সমরাস্ত্র, মানুষ হত্যার অবিশ্বাস্য আয়োজন একমাত্র মাদ্রাসার ছাত্রদেরই জন্যই ঘটেছে। নয় কি? আধুনিক শিক্ষা বা বিজ্ঞান চর্চার জন্য নয়। মুসলমানরাই পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়েছে, হিরোশিমা নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণ করেছে। একমাত্র সাদ্দাম হোসেনই বায়োলজিকাল যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করছে। মুসলমান ছাড়া এই বদকাজগুলো করবেটা কে?

জীবিত শিশু নাকি মৃত মূর্তি? আমাদের আলোচনার শুরুতেই এই প্রশ্নটা তুলতে চাইছি এই সভ্যতার চরিত্র সম্পর্কে তর্ক আরও খোলাসা করে তোলার জন্য। এই প্রসঙ্গে *দি ইকনমিস্ট* পত্রিকার (৩ নভেম্বর ২০০১) একটি ছবির প্রতি নজর দেবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব। একটি শিশু আরেকটি শিশুকে কাঁধে করে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে প্রাণে বাঁচবার জন্য ছুটে যাচ্ছে। এই ছবির পাশে *ইকনমিস্টের* ঘোষণা হল, 'এতে আমাদের প্রাণ কাঁদে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধটা খুবই দরকার' (A heart-rending but necessary war)। কথাটা পরিষ্কার। বলা হচ্ছে, আমাদের স্বার্থে আমরা এই শিশুদের হত্যা করবই। আমাদের মন খারাপ লাগবে। কিন্তু 'In this war, there will be no going back'। মরুক নারী, শিশু আর সাধারণ মানুষ – কিন্তু এই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যাবে না।

এই হল পশ্চিমা সভ্যতা। তথাকথিত 'আধুনিক সভ্যতা'। *ইকনমিস্ট* যেমন তেমন পত্রিকা নয়। ব্যাপারটিকে নিছকই একটি পত্রিকার ব্যাপার গণ্য করলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। এখানে খেয়াল করতে হবে এই কথাগুলো লিখিতভাবে বলা

হচ্ছে। এই যুদ্ধ ও সহিংসতার পক্ষে এই নীতিবর্জিত ও নির্মম সিদ্ধান্ত। এই হচ্ছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। ছবি ছাপিয়ে, এমনকি যে ধরনের শিশুদের মারা হবে তাদের ছবি ছেপে দিয়ে অনায়াসে ও অকাতরে শিশুদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়েছে। হচ্ছে। বলছে *দি ইকনমিস্ট*, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতি সামনের সারির মতাদর্শিক প্রতিনিধি। প্রধান-প্রধান পশ্চিমা পত্রিকায় এইভাবেই হত্যার কথা বলা হয়। শুধু সাদ্দাম হোসেন, মোল্লা ওমর বা ওসামা বিন লাদেন নয় – শিশু ও নিরীহ মানুষও তাদের টার্গেট। নিরীহ অবোধ শিশু মরুক কিন্তু আমাদের স্বার্থই বহাল থাকবে। অতএব যুদ্ধ মানেই সকলকে আমাদের অধীনস্থ করা – এই হচ্ছে এই ধরনের কভার স্টোরির মর্মার্থ।

ক্লিনটন প্রশাসনের সেক্রেটারি ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল – ইরাকে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে পাঁচ লক্ষ ইরাকি শিশু মারা গিয়েছে, এই সম্পর্কে তাঁর মতামত কি? তিনি বললেন, 'এটা শক্ত সিদ্ধান্ত'। তবে সবদিক বিবেচনা করে we think the price is worth it। আমরা সবকিছু বিবেচনা করে যা করেছি তার জন্য পাঁচ লাখ ইরাকি শিশুর মৃত্যু এমন কিছু নয়। ঠিকই আছে।

এটাই যখন বাস্তবতা তখন এর বিপরীতে ওসামা বিন লাদেন বা তালেবানদের কর্মকাণ্ডের নৈতিক মূল্যায়ন রীতিমতো হাস্যকর ও তুমুল তামাশা ছাড়া কিছুই না। কে সন্ত্রাসী আর কে সন্ত্রাসী নয়, সেটা বৃথাবাহাস। 'সন্ত্রাস' সম্পর্কে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ও নীতিকথাও বাজে, ফালতু তর্ক। প্রশ্নটা আসলে অতি সহজ ও সরল। জর্জ বুশ সেটা খুব সুন্দর ভাষায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমরা এবং তোমরা। হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে অথবা তোমরা ওদের পক্ষে – অতএব আমাদের দুশমন। সন্ত্রাসী। তোমাদের বরাতে ওদের মতোই ধ্বংস তোমাদের অবধারিত। আমাদের শত্রু হবার শাস্তি তোমাদের ভোগ করতেই হবে। হয় তোমরা আমাদের আধিপত্য ও অধীনস্থতা মেনে নাও – অথবা ধ্বংস হয়ে যাও। এই হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত। এখানে এসে 'আধুনিক সভ্যতা'র দিগন্ত হঠাৎ প্যান্ট (এমনকি প্যান্টের তলের আন্ডারওয়ার) খুলে ল্যাংটা হয়ে সামনে ঝুলে পড়েছে। এখন আমাদের কী কর্তব্য? বুদ্ধমূর্তি বনাম আফগান শিশু নিয়ে আহমদ ছফার উদ্বিগ্নতাই আরও তীব্রভাবে *ইকনমিস্টের* ছবির মধ্য দিয়ে হাজির হয়েছে। 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'র প্রথম আলোচনার জন্য আমরা যে-বিষয় স্থির করেছি, তার গোড়ায় এই গুরুতর প্রশ্নগুলো রয়েছে।

## ৫। পুঁজি ও শ্রেণীসংগ্রাম

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং বহু জনগোষ্ঠি, ছোটবড় জাতি ও জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও ইতিহাস ঝাড়ে-বংশে বিলকুল খতম করে কিংবা নামে মাত্র বহাল রেখে 'আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা' (সভ্যতা!) গড়ে উঠেছে। অনেকেই চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অনেকের জন্য অপেক্ষা করছে সর্বনাশী ভবিষ্যৎ। উপনিবেশীকরণ এবং পুঁজিস্ফীতি ও পুঞ্জিভবনের প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ফল এই 'আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা'।

গত কয়েক দশকে এই ব্যবস্থার গতরে নয়া কিছু উপাদান বা চেহারাসুরতে নতুন ভাবসাব খেয়াল করে অনেকে একে 'বিশ্বায়ন' বা 'গোলোকায়ন' বলে চিহ্ন দান করছেন। কিন্তু পুঁজির খাসিলত সম্পর্কে মার্কসের একটা মৌলিক অর্থশাস্ত্রীয় বোঝাবুঝি আছে। সেখান থেকে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে দাবি করা কঠিন। ডিম ও ডিম থেকে বেরিয়ে আসা ছানা কি চরিত্র বা গুণগত ভাবে আলাদা? নাকি সেটা তাঁদের গড়ে ওঠার দুটো ঐতিহাসিক স্তর মাত্র? কিম্বা ছানা আর তার বয়স্ক অবস্থা? ইত্যাদি।

ব্যাপারটি অনুধাবনের জন্য 'স্বভাব' ও 'গুণ' নামে দুটো ধারণা আমাদের দরকার। ডিম আর মুরগির ছানার স্বভাবে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু ডিমের গুণ আর মুরগির গুণ এক নয়। কিন্তু মার্কসের কথা হোল মোরগের ডিম হলে সেটা যে মোরগই হবে তার জন্য ডিম ফুটিয়ে মোরগের গুণাগুণ বিচারের দরকার নেই। পণ্য-টাকা-পণ্য – পণ্যের এই বিচলন চক্র যখন টাকা-পুঁজি-টাকায় পরিণত হয়েছে এবং টাকা দিয়ে যখন উৎপাদনের উপায় ও শ্রম শক্তি কেনা যাচ্ছে তখনই মার্কস বলে ফেলতে পেরেছিলেন 'পুঁজি বিশ্ব ঐতিহাসিক'। তাঁকে ২০০১ সাল অবধি বেঁচে থেকে পুঁজির গুণ বিচার করতে হয় নি। তবুও পুঁজিতন্ত্র নাকি দুনিয়াব্যাপী পরিব্যাপ্তি লাভের এই কালে স্বভাবেও বদলে গিয়েছে এই রটনা আমরা শুনি। প্রমাণ কেউই সফল ভাবে দাখিল করতে পেরেছেন বলে দেখি নি। গুণে আর স্বভাবে গোলমাল পাকিয়ে বলা হয় যেহেতু পুঁজি আমূল বদলে গিয়েছে ফলে শ্রেণীসংগ্রাম পুরনো ব্যাপার। এখন উত্তরাধুনিকতার যুগ। যদি সত্য বলে কিছুই নির্ণয় করা না যায় তাহলে তো কোন রাজনীতিই সম্ভব নয়। কোন সত্যের ভিত্তিতে মানুষ সংগঠিত হবে? পুঁজির বিরুদ্ধে লড়বে?

ঔপনিবেশিকতার নির্মম প্রক্রিয়া, প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক জীবনযাপন ও অপরাপর পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো পুঁজি নির্মমভাবে ধ্বংস করে নিজের পথ করে নিয়েছে। নিচ্ছে। এই ঘটনাটি যে আসলেই ঘটে এবং ঘটবার কারণ পুঁজির চরিত্রের মধ্যে নিহিত সেটা যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বেশ কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণসহ কার্ল মার্কস আমাদের শিখিয়েছেন। ইতিহাসের কথা বললে এই গোড়ার কথাটাই এসে পড়ে। তাঁর কাছে আমাদের এই ঋণখানা আজও রয়ে গেল। শোধ হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়েছে। সম্প্রতি কাতারের দোহা শহরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে চীন 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'য় মোটামুটি বীরের বেশেই প্রবেশ করেছে। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' আফগানিস্তানে ইঙ্গ মার্কিন আগ্রাসনকে চীন সমর্থন করেছে। এতে মার্কসের প্রতি আমাদের ঋণ আরও বাড়ে। কারণ কেন সেটা ঘটে তার ভেতরের কেচ্ছা আমরা পুঁজির অর্থশাস্ত্র থেকে বেশ খানিকটা মালুম করতে পারি।

সারা দুনিয়াকে পুঁজি তার লজিক, তার গতিপ্রক্রিয়া বা তার অপ্রতিরোধ্য শাসন ও শোষণের অধীনস্থ করবে। এটাই নিজের শক্তির বাইরে অন্য শক্তির কাছে মানুষের শেষ দাসত্ব। কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস একদিন এই দাসত্ব থেকে নিজেই মুক্তি লাভ করবে – এই প্রতিশ্রুতি আমরা মার্কসের কাছ থেকে পেয়েছি। সেটা আপনা আপনি বা

আপসে আপ ঘটবে এই কথা মার্কস বলেন নি। পুঁজির প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে শ্রেণী ভেদ এবং কাজে কাজেই শ্রেণীসংগ্রামের কথাটা সেই কারণে এসে যায়। মানুষ তো নিছকই বস্তু বা প্রকৃতিমাত্র নয়। পুঁজির ইতিহাস যদি প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা হয় সেখানে ছন্দপতনের, অর্থাৎ পুঁজির বিনাশ এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে সত্যিকারের মানুষের ইতিহাসে গুণগত উল্লম্ফনের সম্ভাবনা শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যেই নিহিত। শ্রেণীসংগ্রামের কথাটা রাজনৈতিক ভাবে আমরা বিস্তর শুনেছি, কিন্তু তার জ্ঞানগত বা দার্শনিক দিগন্তে ওড়াওড়ির বরাত আমাদের খুব একটা হয় নি।

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা দুনিয়াব্যাপী একটা সংগ্রাম চলছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মুখে সিয়াটলের বিক্ষোভ এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ধনীদেশগুলোর জোটের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক নানান লড়াই দেখতে দেখতে হঠাৎ নিউইয়র্কের ঘটনা ঘটল। বিশ্বব্যবস্থার দুই প্রধান প্রতীক নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের ওপর হামলা হল। যে ইমারত বা স্থানগুলোর ওপর হামলা হয়েছে তাদের প্রতীকী তাৎপর্য আছে। হামলার লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্য দিয়েই একটা প্রতীকী ভাষ্য তৈরি হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই লড়াই। এটা ধর্মযুদ্ধ নয়। সংগ্রামের শ্রেণীচরিত্রও ওর মধ্য দিয়ে যথেষ্ট পরিষ্কার। এই লড়াইয়ে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে অবশ্যই। ওকে কেন্দ্র করে বিস্তর নীতিকথা ও 'সন্ত্রাস' সম্পর্কে নানাবিধ তত্ত্ব এবং সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক চলছে। এই ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিতর্ক নিছকই নীতিবাগীশিতে পর্যবসিত হচ্ছে। নীতিবাগীশির শ্রেণীভিত্তি নিয়ে কোন আলোচনাও আমার চোখে পড়ে নি।

এখানকার বিশ্বব্যবস্থায় যাদের জন্য করুণ ও রক্তাক্ত নিলয় অপেক্ষা করছে বা যারা আমাদের চোখের সামনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের পরিণতির খবর একদমই টের পায় নি, এমন নয়। অতীতের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠি ও জাতিসমূহের করুণ ও নির্মম পরিণতির ইতিহাস দেখে হয়তো তারা নিজেদের নিয়তির আগাম খবর পেয়ে গিয়েছেন। ভুক্তভোগী জাতি, জনগোষ্ঠি বা নিপীড়িত শ্রেণীগুলো তাদের নিজেদের জীবন থেকেই টের পায়। যদি তাই হয় তাহলে কী এই সর্বনাশ, এই বিলয় এই ধ্বংস বিলীয়মান জনগোষ্ঠি বা জাতিগুলো নিয়তি জ্ঞান করে মেনে নেয়? নিশ্চয়ই নয়। ব্যাপারটি কি প্রতিবাদ, বিদ্রোহ বা রক্তাক্ত প্রতিরোধ ছাড়া শেষ হয়? নিশ্চয়ই না। তাহলে ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর বা তালেবানরা নিশ্চয়ই খামাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করে নি। তারা একটা জীবনযাপন পদ্ধতিও রক্ষা করতে চায়। 'আধুনিকতা'র নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচারের মানদণ্ডে তালেবানদের চিন্তা, আদর্শ, জীবনচর্চা ইত্যাদি একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা 'মৌলবাদী' বলে নিন্দিত ও ঘৃণিত। ঠিক আছে। কিন্তু এই ধরনের আদর্শ ও জীবনযাপন পদ্ধতি মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মে এবং অন্যান্য সংস্কৃতিতেও তো ভুরি ভুরি আছে। এই জায়নিজম বা ইহুদিবাদ তো 'আধুনিক

সভ্যতা' বা সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে নিন্দিত বা ঘৃণিত নয়। ইসরাইলকে ধ্বংস করা দূরের কথা, তাকে রক্ষা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অঙ্গীকার। কিন্তু কেন ওসামা বিন লাদেনকে মরতেই হবে? কেন আফগানিস্তানে তালেবানী শাসন ধ্বংস করতে হবে? কেন একটি গরিব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে বৃষ্টির মতো বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিতে হবে? কেন? আসলেই। সেটাই তো মূল প্রশ্ন।

আইরিশ রেভিউলিশনারি আর্মিও পশ্চিমা মানদণ্ড অনুযায়ী সন্ত্রাসী হবার কথা। কিন্তু যে সকল সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড খাড়া করেছে সেখানে আইআরএর নাম নাই। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে আইআরএর সন্ত্রাসী বোমা হামলা ও রক্তপাতের ঘটনা বহু। বহু নিরীহ মানুষ সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছে। কই টনি ব্লেয়ার বা তাঁর আগের কোন প্রধানমন্ত্রী আয়ারল্যান্ডকে বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেবার কথা তো বলেন নি? তাহলে আফগানিস্তান কেন?

## ৬। এটা কি আসলেই ক্রুসেড?

জর্জ বুশ প্রথমেই বলেছিলেন ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়েদার ইসলামী সন্ত্রাস বা জেহাদের বিরুদ্ধে এটা 'ক্রুসেড'। নিজের কথা নিজে গিলে খেতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যাঁরা ক্রুসেডের ভয়াবহতা ও হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে জানেন তাঁরা প্রমাদ গুণেছিলেন। পোপ জন পলও এতে বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁর নীতি নির্ধারকরা তাঁকে বলেছিলেন বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠির মধ্যে এবং মুসলমান দেশগুলোর ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে 'গ্লোবাল কোয়ালিশন' করার পরিকল্পনা তিনি হাতে নিয়েছেন, সেটাও কাজ করবে না। কিন্তু কথাটা বলে জর্জ বুশ ভাল করেছেন। তাঁর দিক থেকে যুদ্ধের চরিত্রটা কেমন এবং তাঁর 'নতুন বিশ্ব যুদ্ধ' সম্পর্কে ধারণাটা কী সেটা আমরা বুঝতে পারলাম।

অনেকের ধারণা রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞতা এবং মাথায় মগজের চেয়ে মাংসের পরিমাণ বেশি বলে জর্জ বুশ মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছেন। এই যুক্তি মানা যেতো যদি ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু 'ক্রুসেড' সংক্রান্ত ধারণাটাই আবার নতুন ভাবে তিনি হাজির করলেন Infinite Justice বা 'অনন্ত ন্যায়বিচার'-এর জন্য যুদ্ধের কথা কয়ে। ঈশ্বরই অনন্ত ন্যায়বিচার করেন, মানুষ নয়। তাহলে তিনি ঈশ্বর নির্ধারিত বা প্রদত্ত বিচারই ইহলোকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সন্ত্রাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাস্তবায়ন করছেন। এটা ক্রুসেড ছাড়া আর কি? সেখানেই তিনি আবার ধরা পড়ে গেলেন। তারপর তাঁর যুদ্ধের নাম বদলিয়ে রাখা হল 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম'।

টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন হামলার পেছনে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়েদাকে নিছকই সন্দেহ করে 'বিশ্বযুদ্ধ' শুরু করে দেবার নজির 'সভ্য' জগতে নাই। শুরু থেকেই ওসামা এই হামলার সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবি করেছেন। তাঁর সম্পৃক্তির কোন প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও দাখিল করতে পারে নি। পরবর্তীতে

এনথ্রাক্স বা বায়োলজিক্যাল যুদ্ধাস্ত্রের হামলা যখন শুরু হল, দেখা গেল তার উৎপত্তি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রথমত এনথ্রাক্স হামলার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেন জড়িত বলে এই যুদ্ধ সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু তার পরিণতি মন্দ হতে পারে বলে প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করে নি।

ওসামা বিন লাদেন কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নন, এমনকি তিনি আফগান নাগরিকও নন। যদি এই হামলা ওসামা করেও থাকে তাহলে তা বড়োজোর একজন ব্যক্তি বা সংগঠনের ক্রিমিন্যাল এক্ট হতে পারে। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেকটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ হতে পারে না। সেটা crime against humanity বা 'মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ৫১ নম্বর চার্টার অনুযায়ী একটি দেশের বিরুদ্ধে আরেকটি দেশের যুদ্ধ হতে পারে না। তাহলে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ঘটনার কারণে একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোন আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পড়ে? তাও এমন এক রাষ্ট্র ও এমনই জনগোষ্ঠি যারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধে বিধ্বস্ত। সবচেয়ে প্রহসন হল এমনই রাষ্ট্র যারা এই কিছুদিন আগেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে লড়েছে এবং জান দিয়েছে। আফগানিস্তানে নির্বিচারে বোমাবর্ষণের যে নৃশংসতা ইঙ্গ মার্কিন শক্তি দেখিয়েছে তার কোন নজির নেই।

একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী আক্রান্তকে আত্মরক্ষার বৈধতা ৫১ অনুচ্ছেদ দেয়। কিন্তু জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখেই জাতিসংঘের ৫১ সনদ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই বৈধতা দিয়েছে। এরই অনুসরণে একই দিনে নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ধরনের 'সন্ত্রাসী' হামলা ন্যাটো ওয়াশিংটন চুক্তির ৫ নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এটা ব্যক্তি বা কোন সংগঠনের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। এটা একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অতএব নিজের প্রতিরক্ষার জন্য এর পাল্টা যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। এই প্রথম উত্তর আটলান্টিক আঁতাতের ইতিহাসে পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করবার তড়িঘড়ি উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করলাম।

পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করবার মধ্য দিয়ে ন্যাটো তাদের Principle of Collective Defence সক্রিয় করল। এর অর্থ কি এই যে ইসলামী হামলার বিরুদ্ধে খ্রিস্টীয় দেশগুলোকে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ করা? পাঁচ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী যদি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সদস্যভুক্ত এক বা একাধিক দেশের উপর সামরিক হামলা হয় তাহলে সেটা সকল দেশের বিরুদ্ধে হামলা হিশাবে বিবেচিত হবে এবং সকলে মিলে তারা পাল্টা সামরিক ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একজন 'সন্ত্রাসী'-র বিচ্ছিন্ন হামলার অভিযোগে জাতিসংঘের আর্টিকেল ৫১ ব্যবহার করার ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এভাবেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার অবাধ ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেলো। এর পাল্টা পদক্ষেপ হতে পারতো জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনের

মেরি রবিনসনের প্রস্তাব। সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মেরি রবিনসন বলেছিলেন, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের ঘটনা কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়। এটা 'এটা মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ'। তার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে হতে পারে। প্রয়োজনে 'সন্ত্রাসী' অপরাধের জন্য একটি বিশেষ আদালতও গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কথা বাতাসে মিলিয়ে গেল। এই ধরনের অপরাধ বিচারের জন্য একটি International Criminal Court গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। তবে সেটা গঠিত হবে ২০০১ বা ২০০৩ সালে। সেই আদালতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার বিচার করা যাবে না। আদলত গঠিত হবার পরে এই ধরনের ঘটনার বিচার হতে পারে।

জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার ও খ্রিস্টীয় জগতের অধিপতি শক্তির দিক থেকে আসলেই তাহলে এটা ক্রুসেড। মুলসমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম বা পরবর্তী ক্রুসেডের সঙ্গে এখনকার ক্রুসেডের অমিল নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মিলও কম নাই। আরবে ইসলাম আবির্ভাবের অতি অল্প সময়ের মধ্যে হজরত ঈসা যে ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ ও বসবাস করেছিলেন সেটা মুসলমানদের দখলে চলে আসে। সেটা ঘটে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ক্রুসেডের যোদ্ধারা তাদের 'পবিত্র ভূমি' মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যায়। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের 'পবিত্র ভূমি' জেরুজালেম মুসলমান অধিকার থেকে উদ্ধার করবার জন্য দ্বিতীয় পোপ আরবান যে War of the Cross বা ক্রুসেডের ডাক দেন তারই প্রতিধ্বনি যেন এই যুগেও শোনা যাচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা প্রথম ক্রুসেডে জেরুজালেম দখল করে নেয়। ক্রুসেডে শুধু সৈনিক নয়, নারীপুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাযজ্ঞের নিষ্ঠুর ইতিহাস স্মরণ করেই পোপ জন পল জর্জ বুশের ক্রুসেডের কথা শুনে আতংকিত হয়েছিলেন। সেই কালে ক্রুসেডের নেতা ছিলেন পোপ স্বয়ং। এই কালে তার সর্দার জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ার।

আদি ক্রুসেড আর ২০০১ সালের ক্রুসেডের মধ্যে পার্থক্য কি? তখনও যুদ্ধটা ছিল জমি দখল নিয়ে। এখনও মামলা ভূখণ্ড নিয়েই। আদি ক্রুসেডে জমি ছাড়া প্রকাশ্য কোন দাহ্য পদার্থ ছিল না। যীশুর জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের পেছনে কিম্বা মুসলমানদের জেরুজালেম দখল করে রাখার পেছনে আত্মার দাহ্যিক ভূমিকা থাকতে পারে। দুই হাজার এক সালের ক্রুসেডকে শুধু জমি দিয়ে বোঝা যাবে না। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা এবং তার পেছনে খ্রিস্টীয় বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্য দিয়ে পদার্থ এক প্রকার হাসিলই হয়েছে বলা যায়। এবারের ক্রুসেডের দাহ্য পদার্থ আসলে তেল এবং গ্যাস। প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতায় ভূখণ্ড বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করবার লড়াইয়ের বৈষয়িক ও আত্মিক কারণ পুরো মাত্রায় বর্তমান।

ক্রুসেড বা জেহাদকে ধর্মযুদ্ধ জ্ঞান করে তার বিচার বা বিশ্লেষণ ওখানেই সমাপ্ত করে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। মার্কসীয় বিচার জেহাদ বা ক্রুসেডের বাহ্যিক রূপ

দেখে সন্তুষ্ট নয়। সেটা ধর্মযুদ্ধ ঠিকই কিন্তু অভ্যন্তরের বৈষয়িক কারণটা অনুসন্ধান করা জরুরি। যে বিশ্বাসে বা যে মতাদর্শের ভিত্তিতে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয় তার সঙ্গে মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি সেই যুদ্ধের বৈষয়িক কারণ গুলিয়ে ফেলে না। যুদ্ধের মতাদর্শ এক জিনিস আর তার অন্তর্লীন কারণ অন্য কথা।

প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা এখনকার আধুনিক বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা হয়ে উঠলেও পুরনো ক্রুসেডের সঙ্গে এখনকার ক্রুসেডের এক বিস্ময়কর মিল আছে। পুরনো ক্রুসেডের সময় হজরত ঈসার জন্মস্থান ও জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের দখলে। প্রবল ধর্মের সেই যুগে এটাই ছিল সর্বোচ্চ সম্পদ, যার জন্য জান দিতে দুই পক্ষই প্রস্তুত ছিল। বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি। তেল ও গ্যাস। যাকে আমরা বিশ্বসভ্যতা বলি তার বৈষয়িক ভিত্তিক মূল উপাদান তেল এবং গ্যাস। এই তেল ও গ্যাসের নিশ্চয়তা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না।

কিন্তু ইতিহাসের প্রহসন এই যে হজরত ঈসার জন্মস্থান বা পবিত্র ভূমি যেমন এখন মুসলমানদের দখলে ছিল, ঠিক তেমনি তেল গ্যাস কী এক অজ্ঞাত কারণে মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ইত্যাদির ইসলাম প্রধান দেশগুলোর দখলে। ক্রুসেডের পুরনো আধ্যাত্মিক স্বার্থের জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে তেলের স্বার্থ। তেলই বর্তমান বিশ্বসভ্যতার ঈশ্বর। অতএব এই ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য। যেহেতু এই তেল প্রধানত ইসলাম প্রধান দেশগুলোতেই বেশিরভাগ মজুদ, অতএব যুদ্ধটার রূপ ধর্মযুদ্ধের আকার পরিগ্রহণ করছে। আরও করবে। এটাই স্বাভাবিক। স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর 'সভ্যতার সংঘর্ষ' নামক থিসিসে খুব একটা ভুল করেন নি। তেলই যেহেতু বর্তমান বিশ্বসভ্যতার প্রাণ, অতএব তাঁর 'সভ্যতার সংঘর্ষ' কথাটিকে পাঠ করতে হবে তেলের সংঘর্ষ হিশাবে। এই তেল আছে ইসলাম প্রধান দেশগুলোতে। কিন্তু খ্রিস্টান প্রধান শিল্পসভ্যতা এই তেল ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তেল শিল্পসভ্যতার অতিশয় আবশ্যিক, অতএব পরম পবিত্র জিনিস। সেই কারণে যুদ্ধের রূপটা আমরা চাই বা না চাই ধর্মযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করতে বাধ্য। সেই কারণে জর্জ বুশের ক্রুসেডের ডাক কিম্বা ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের জেহাদ পবিত্র তেলের লড়াই ছাড়া আর কি? ক্রুসেড ও জিহাদ দুটোই তৈলাক্ত।

মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৯৬ সালে যখন তালেবানরা সরকার গঠন করলো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানদের সম্পর্ক বেশ ভালো। তালেবান নেতারা টেক্সাসের হিউসটনে তেল কোম্পানি ইউনোকল এর কর্মকর্তাদের সাথে চা-নাস্তা খেতে গিয়েছিল। কোম্পানির তেল এবং গ্যাস উত্তোলন থেকে মুনাফার একটা বড় অংশ তালেবানদের দেওয়া হবে বলে তাদের লোভ দেখানো হয়। কোম্পানি চেয়েছিল তেল এবং গ্যাসের জন্যে সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়ে একটি পাইপলাইন বসাতে। একজন মার্কিন কূটনীতিক এই কথা বলতেও দ্বিধা করেন নি যে আফগানিস্তান আমেরিকার তেল কলোনী হয়ে উঠবে, সেখানে পশ্চিমা দেশ থেকে আসা বিরাট অংকের মুনাফা থাকবে, কিন্তু গণতন্ত্র থাকবে না। নারীদের

কোন আইনগত অধিকার না থাকলেও অসুবিধা নেই।

খবর হল, চুক্তিটি হয় নি। এখন এই তেলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করা বুশ প্রশাসনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বুশের গোপন ইচ্ছা হচ্ছে ক্যাসপিয়ান বেসিনের মাটির নীচের সর্ববৃহৎ তেল এবং গ্যাসের মওজুদ সন্ধান করা। আমাদের পরিষ্কার খেয়াল রাখা দরকার এই তেল ও গ্যাস পেলে আমেরিকার আরও একটি জেনারেশন অনায়াসে চলতে পারবে। জীবাশ্ম ভিত্তিক সভ্যতার আয়ু আরও বাড়বে।

যদি এটা পেতে হয় তাহলে পাইপলাইনগুলো আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তালেবানরা বাধা হয়ে উঠলো। এখন তেল ও গ্যাস পেতে হলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতেই হবে। মার্কিনীরা আফগানিস্তানে একটু মডারেট বা মাঝারি ধরনের তালেবান সরকার চায়, তারা যেন আফগানিস্তানে একটি ঢিলেঢালা ফেডারেশন চালাতে পারে। তাই জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের 'সন্ত্রাস বিরোধী' যুদ্ধ একটা ভুয়া কথা। নেহায়েতই লোক দেখানো।

## ৭। বিন লাদেন : যে সত্য নিষিদ্ধ

'বিল লাদেন: যে সত্য নিষিদ্ধ' (Bin Laden, Le Verité Interdité) নামে একটি বই সম্প্রতি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন জাঁ শার্ল ব্রিসকা এবং গিওম দাসকি। সেই বইয়ের মূল কথা, 'সন্ত্রাসী' তালেবান বা আই কায়েদা নেটওয়ার্ক ধ্বংসের যে চোটপাট আমরা বুশ-ব্লেয়ার চক্রের মুখে শুনছি সেটা ভুয়া। লড়াইটা আসলেই তেল গ্যাসের জন্য। কথাটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য নতুন নয়। কিন্তু এই দুজনেই পৃথিবী বিখ্যাত intelligence analyst অর্থাৎ গোপন গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষক। বইটি বেরুবার পর অনেকেই দাবি করছেন বিপুল তথ্যে সমৃদ্ধ এই বুশ আর ব্লেয়ারকে বিপদেই ফেলবে এবং তাদের Dirty Afgan War বা নোংরা আফগান যুদ্ধের গোমর ফাঁস করে দেবে।

নব্বই দশকের শেষের দিক অবধি ব্রিসকা ছিলেন ভিভেনদি নামে একটি ফরাসি কোম্পানির অর্থনৈতিক বিশ্লেষক। ব্রিসকা ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার (DST) জন্যও কাজ করেছেন এবং ১৯৯৭ সালের ফরাসি গোয়েন্দাদের জন্য বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল কায়েদা নেটওয়ার্কের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন। দাসকি একজন গোয়েন্দা বিষয়ক সাংবাদিক এবং Intelligence Online নামে একটি পত্রিকা বের করেন।

এগারোই সেপ্টেম্বরের আগে তালেবানদের সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সদয়, এমনকি দোস্তির। তালেবানদের দেখা হতো, "মধ্য এশিয়ার স্থিতিশীলতার উৎস হিশাবে যারা মধ্য এশিয়া ভেদ করে তেলের পাইপ লাইন নির্মাণ করার জন্য জরুরি। ... তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাজাকিস্তানের সমৃদ্ধ তেল ক্ষেত্রগুলো থেকে তেল টেনে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে ভারত মহাসাগর অবধি নিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ার" জন্য তালেবানদের ওপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর

করেছিল। কিন্তু তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তেল কোম্পানির লুটপাটের প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। সেখানেই গোলমাল দেখা দিল।

ক্যাসপিয়ান সাগর অঞ্চলের দেশগুলোতে (আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানে) যে তেলের রিজার্ভ আছে তার পরিমাণ কমপক্ষে দুইশ বিলিয়ন ব্যারেল। পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের পরিমাণের তুলনায় এটা তিন ভাগের একভাগ। এই বিপুল তেলসম্পদ লুটের জন্যই আজ আফগানিস্তানের যুদ্ধ।

এই তথ্যগুলো যার বরাতে বলা হয়েছে তাঁর নাম ও নীল। ইনি একজন আইরিশ-আমেরিকান। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তেল কোম্পানিগুলো তালেবানদের কাছ থেকে আপোষে তেল পেয়ে যেতো তাহলে তেলের বিশাল বিকল্প উৎসের ওপর তাদের একচেটিয়া দখল কায়েম হয়ে যেতো। ব্রিসকা ও দাসকি বলছেন, "রাশিয়া মধ্য এশিয়ার এই তেল ও গ্যাস খবরদারি করবে। বুশ সরকার সেটা বদলে দিতে চেয়েছেন এবং বদলাতে গিয়েই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া।"

নভেম্বর ১৯ তারিখের Irish Times-এর একটি প্রতিবেদনে জানা যায় ও নীল ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বোমার ঘটনা, ১৯৯৬ সালের সৌদি আরবের মার্কিন ঘাঁটির হামলা, ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দার-এস-সালামের মার্কিন দূতাবাস আক্রমণ এবং ২০০০ সালে ইউএসএস কোলের ঘটনা তদন্ত করেছেন। এই তদন্ত করার কাজ করতে গিয়েই তার মনে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে 'সন্ত্রাস' সংক্রান্ত কোন তদন্তে মোটেও উৎসাহী নয়। বরং তদন্তে তাকে পদে পদে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিরক্ত হয়ে তিনি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে নিরাপত্তা প্রধান হিশাবে নতুন চাকুরি গ্রহণ করেন। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ও নীলও মারা যায়। ব্রিসকা ও দাসকি ও নীলের সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রেখেছিলেন তার মূল্য অতএব অপরিসীম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষির এক পর্যায়ে মার্কিন প্রশাসন তালেবানদের বলেছে, "হয় আমাদের সোনার কার্পেটে তোমাদের মুড়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ কর, অথবা অবিরাম বোমা বর্ষণের কার্পেট বিছিয়ে আমরা তোমাদের কবর রচনা করব।" এই লেখা যখন লিখছি তখন নদার্ন এলায়েন্স, আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাজা জহির শাহ এবং তালেবান পন্থী নয় এমন পশতুন নেতাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তালেবান-উত্তর সরকার গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। প্রহসন হল এই শহরেই তালেবানদের সঙ্গেও দর কষাকষি হয়েছিল।

বইটির তথ্যানুসারে বুশ প্রশাসন তালেবানদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে ২০০১ সালের শুরুর দিকে। ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদেও কথাবার্তা হয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে এশিয়া বিভাগের দেখাশোনা করেন ক্রিস্টিনা রকা। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের ঘটনার আগে ক্রিস্টিনা পাকিস্তানে তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুস সালাম জায়িফের সঙ্গে আগস্টের দুই তারিখে কথা বলেন। জেনে রাখা ভাল যে ক্রিস্টিনা

রকা হচ্ছেন এক কালে আফগানিস্তানে 'মৌলবাদী' গেরিলাদের পক্ষে কাজ করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি অভিজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যক্তি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র অধীনে 'মৌলবাদী' ইসলামী গোষ্ঠিকে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করার দায়িত্বে ছিলেন। বিশেষত আফগান মুজাহেদিনদের স্টিংগার মিসাইল হস্তান্তরের দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন। তাঁর মাধ্যমে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুজাহেদিনরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়েছে।

ব্রিসকা এবং দাসকির তথ্য থেকে জানা যায় যে তালেবানদের অতি গোঁড়া বা অতিশয় 'মৌলবাদী' বলে যে-ধারণা তৈরি হয়েছে সেটাও পুরোপুরি সত্য নয়। সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক বহাল থাকার সময় এই সত্য নানাভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। তালেবানরা পশ্চিমা বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন করার জন্যও সচেষ্ট ছিল। তারা লায়লা হেলমস নামে একজন বিশেষজ্ঞকে এই কাজের জন্য নিয়োগ দেয়। লায়লা হেলমসের আবার আরেকটি পরিচয়ও ছিল। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কী করে কাজ করে তিনি সেই বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার কাজ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তালেবানদের স্বীকৃতি আদায় করা। লায়লার চাচা রিচার্ড হেলমস সিআইএর প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং তেহরানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কী করে কাজ করে তার খবরাখবর লায়লা চাচার মাধ্যমেই জানতেন।

ও নীল দাবি করেছেন যে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়েদা নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সকল তথ্যই সৌদি আরবের কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু সৌদি রাজপরিবারকে বিব্রত করতে যুক্তরাষ্ট্র রাজি নয়। দাহরানে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলায় ১৯ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হবার তদন্ত করতে গিয়ে এফবিআই অভিযুক্ত সন্দেহভাজনদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এই বিষয়ে কোন হৈ চৈ করতে রাজি হয় নি। সৌদি সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য সন্দেহভাজনদের নিজেরাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। ও নীল তাঁর তদন্ত টিম নিয়ে সৌদি আরব গিয়েছিলেন কিন্তু নভেম্বর ১৯ তারিখে প্রকাশিত Irish Times এর তথ্য অনুযায়ী তাঁদের বোমা হামলার জায়গা থেকে কিছু জিনিসপত্র কুড়িয়ে আনার অধিক কোন কাজের সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন করে দেয় নি।

ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব আরব আমীরাত ও উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো সবসময়ই তেলের অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে পাক খাচ্ছে। প্রথমে ইংরেজ এই অঞ্চলের তেলের ওপর দখলদারি কায়েমের জন্য লড়েছে, তারপর হামলা করেছে ফরাসিরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তেলের থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছে। জীবাশ্মভিত্তিক শিল্পসভ্যতা ততোদিনে যে অবস্থায় পৌঁছেছে তার কারণে তেল সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং তেলের উৎসের নিরাপত্তা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদ ১৯৪৫ সালের

মার্চে একটি গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে দীর্ঘকালীন সামরিক ভৌগলিক কৌশলগত মৈত্রীর দাসখৎ বলা যায়। জর্জ বুশের 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম' সম্পর্কে এমনকি তেল সম্পদ বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল এর দুটো লক্ষ্য। এক নম্বরে 'সন্ত্রাসী'দের পাকড়াও করা, সেটাই ফলাও করে বলা হয়। দুই নম্বরে পারস্য উপসাগর ও ক্যাসপিয়ান সাগর সন্নিহিত ভূগোলে তেল ও গ্যাসের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করা। প্রথম কথাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতোই জোরগলায় মুখ্য ব্যাপার বলে হৈ হল্লা করুক, দুই নম্বর লক্ষ্যটার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। এই কথা নোয়ম চমস্কি বা এডওয়ার্ড সায়িদের মতো বামঘেঁষা মানুষের নয়। বলছেন আমহার্স্ট শহরের হ্যাম্পশায়ার কলেজের প্রফেসর মাইকেল টি ক্লেয়ারের মতো তেল বিশেষজ্ঞ। ইনি *Resources Wars: The New Landscape of Global Conflict* নামক বই লিখে বিখ্যাত।

বুশ প্রশাসনের বহু কর্মকর্তাই তেল কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। গত বছর পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ছিলেন হেলিবারটন নামে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। এই কোম্পানি তেল কোম্পানিগুলোর কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলেজা রাইস ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত শেভরন তেল কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। বাণিজ্য সেক্রেটারি ডোনাল্ড ইভানস এবং স্টানলি আবরাহাম টম ব্রাউন নামে আরেকটি তেল কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন।

তাহলে 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম' তালেবান ও আল কায়েদাকে ধ্বংস করতে চায় কেন?

এক. মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য যেসব ইসলামপন্থী দল লড়ছে তাদের 'মৌলবাদী' বলে বর্বর ও অসভ্য প্রমাণ করা ও তাদের ধ্বংস করে মার্কিন দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দুই. বিন লাদেন ও তালেবানরা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বাধা এবং মতাদর্শিকভাবেও বিপজ্জনক হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং এই ধরনের প্রতিটি সামরিক সংগঠনকে উচিৎ শিক্ষা দান করা।

তিন. মধ্য এশিয়ায় মার্কিন তাবেদার সরকার উৎখাত করে জঙ্গী ইসলামপন্থী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার কায়েমের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা।

লক্ষ্য করার বিষয় যে যুদ্ধ শুরুর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজিস্তানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বুশের চেয়ে ব্লেয়ার কোন অংশে কম নয়। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি নিরাপরাধ মানুষ হত্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যারা ক্লাস্টার বোমা মেরে বলে ভুল হয়েছে এটা তাদের ভাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। হত্যা মানে হত্যা। এটা একটা প্লেন নিয়ে একটি বিল্ডিং-এর ওপর ধাক্কা মারলে যেমন অপরাধ তেমনি হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস কিংবা লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিটে বসে হুকুম দিলেও একই ধরনের

অপরাধ হয়। যদি ব্লেয়ার আসলেই সন্ত্রাসের বিরোধিতা করতে চান তাহলে তাঁকে প্রথমেই অস্ত্রব্যবসা থেকে সরে আসতে হবে। ব্লেয়ার যদি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হন তাহলে তাকে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ থেকে সরে আসতে হবে।

ওসামা বিন লাদেনের দুর্ভাগ্য তিনি ধনী এবং সৌদি। সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে লড়ে দেশে ফিরে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর নিজের দেশটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে রেখেছে। সেটাও তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য। ফলে তাঁর বন্দুকের নল ঘুরে গেল। কিন্তু সৌদি হবার কারণে ওসামা হয়ে উঠলেন রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। কারণ সৌদি আরবে ও মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েই চলল। তাঁর কারণে সৌদি আরবের রাজতন্ত্রের যদি পতন ঘটে তবে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সভ্যতার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার সমীকরণে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। অতএব ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত ধরতেই হবে। এখন প্রচার করা হচ্ছে তিনি নাকি বলে গিয়েছেন যে তিনি শত্রুর হাতে ধরা দেবেন না। তাঁর দেহরক্ষীরাই যেন তাঁকে ধরা পড়বার আগে মেরে ফেলে। অর্থাৎ নিজেদের হাতে ওসামা বিন লাদেনকে মারবার দায়দায়িত্ব পশ্চিমা দেশগুলো নিতে চাইছে না। তাকে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটাও হবে বিপজ্জনক। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ওসামা বিল লাদেন আদৌ যুক্ত ছিলেন তার কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। ওসামা নিজেও তা অস্বীকার করেছেন।

## ৮। ক্রুসেড ও জেহাদ

তেল ও গ্যাসের যুদ্ধটাই ধর্ম যুদ্ধের রূপ নিচ্ছে এবং আসলেই এই দাহ্য পদার্থগুলোই সভ্যতার প্রধান সংকট। গোড়ার এই কথাটা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। সভ্যতার সংকট কথাটা আমরা এখানে উল্লেখ করছি সভ্যতা সম্পর্কে হাওয়াই ধারণা থেকে নয়। আমরা বলছি শিল্পসভ্যতার গোড়ায় রয়েছে জ্বালানি। তেল এবং গ্যাস। যদি এই জ্বালানি শিল্পসভ্যতা নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তার পতন বা ধ্বংস অনিবার্য। লড়াইটা কিন্তু এখন শুরু হয় নি। শুরু হয়েছে সত্তর দশকের গোড়া থেকে।

যদি সভ্যতার সংকটের এই বিশেষ চরিত্রের দিকে আমরা মনোযোগ দেই তাহলে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথাগত শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার ক্ষেত্রে নতুন কিছু বিষয় আমাদের ভাবার দরকার আছে। পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা কথাটা আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিচার থেকে বলি, প্রাকৃতিক বা সভ্যতার বস্তুগত উপাদানের দিক থেকে বিচার করে বলি না। 'আধুনিক সভ্যতা'র জীবাশ্ম ভিত্তি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ধারণা দুর্বল। এই সম্পর্কে মূল সংগ্রামের ধারাটা পরিবেশ ও নারী আন্দোলন থেকে এসেছে।

ধরা যাক পশ্চিমা সভ্যতার সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু এতে জীবাশ্ম-ভিত্তিক শিল্পসভ্যতার কোন পরিবর্তন হবে না। এতে তেল ও গ্যাসের ওপর দখলদারিত্বের দ্বন্দ্ব কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু ভবিষ্যত

সম্পর্কে অনুমান না করে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে নজর ফেরানো দরকার।

জর্জ বুশের এই ক্রুসেড একই সঙ্গে বর্ণবাদী যুদ্ধ। সেই কারণে আরব, আফগান ও ইসলাম প্রধান দেশের জনগোষ্ঠিকে বর্বর, ট্রাইবাল ও পশ্চাৎপদ প্রমাণ তাকে করতেই হচ্ছে। কারণ কাউকে অমানুষ বা সভ্য জগতের অংশ নয় প্রমাণ করা গেলেই তাকে সহজে বোমা মেরে হত্যা করলে কোন দয়া বা মায়ামমতা জাগে না। এই যুদ্ধ ক্রুসেড এই কারণে যে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে একটি মতাদর্শ হিশাবে জঙ্গী ইসলামের ও জঙ্গী মুসলমানদের মোকাবিলা করতেই হবে। তেল ও গ্যাসের দখল থেকে মুসলমানদের উৎখাত করতেই হবে। তাঁরা সেটা জানেন এবং আগে থাকতেই এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তাঁরা বারবার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিভক্ত রাখবার জন্য তাঁদের বলতে হচ্ছে এই যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। এই যুদ্ধ নাকি 'সন্ত্রাসী'দের বিরুদ্ধে। মনে আছে কিনা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ও বলা হয়েছিল এই যুদ্ধ ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে নয় বরং সন্ত্রাসী 'কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতা ও সভ্যতার শত্রু। ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধ ঠিকই জারি রয়েছে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হয় নি। চলছে। ক্রুসেড হলেও জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে এই যুদ্ধ চালাতে হবে 'সভ্যতা', 'মুক্তি' বা সন্ত্রাস বিরোধিতার নামে। ভূতের মুখে রাম নাম।

অন্যদিকে ওসামা বিন লাদেনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ফাঁকি খুঁজে আমরা কূটতর্ক করতে পারি। বাস্তবে আমরা দেখছি তারা ইঙ্গ মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে পিছু হটে আসে নি। এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যায় সংগ্রামীকে একত্র করার জন্যে তারা 'জেহাদের' ডাক দিয়েছে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বলে এই কালে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আদৌ সম্ভব হতো কিনা সেটা বিচক্ষণ যে কেউই ভেবে দেখতে পারেন। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণী, জাতি ও জনগোষ্ঠির লড়াই পরিগঠিত করে তোলার ব্যর্থতার জন্য ক্রুসেডের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ জেহাদের রূপ নিচ্ছে। ফলে ওসামা বিন লাদেন বা তালেবানদের 'মৌলবাদী' বলে আমাদের সুখানুভূতি হতে পারে, কিন্তু সেটা আমাদের ইতিহাসবোধের ঘোরতর অভাবেরই পরিচয়। যে লড়াই বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল ভুক্তভোগী শ্রেণী, জাতি ও জনগোষ্ঠির লড়াই হবার কথা তাকে মুসলমানদের জেহাদি লড়াইয়ে সংকীর্ণ করে এনে ওসামা নিজের ধ্বংস যেমন ত্বরান্বিত করেছেন, তালেবানরাও নিজেদের নিশ্চিহ্ন করার বাস্তবিক শর্ত তৈরি করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতি কি আদৌ সম্ভব ছিল?

যুদ্ধের মতাদর্শ দুই ক্ষেত্রেই উল্টোভাবে হাজির হচ্ছে। বুশ আর টনি ব্লেয়ার তাঁদের ক্রুসেডকে বলছেন, 'ইনফিনিট জাস্টিস', বলছেন অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম – সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অন্যদিকে ওসামা, মোল্লা ওমর আর তালেবানরা একে বলছে 'জেহাদ' – আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম। যদি এটা জ্বালানি যুদ্ধ হয় এবং তেল ও গ্যাস যদি ইসলাম প্রধান দেশগুলোতেই থেকে থাকে তাহলে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের

বিরুদ্ধে লড়বার আর কী মতাদর্শ তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর জনগণের রয়েছে? কী বলে তারা এই যুদ্ধে সৈনিক সংগ্রহ করবে? যে যুদ্ধ বৈশ্বিক, তার যোদ্ধাও নিশ্চয়ই এক দেশের হবে না। সত্যি যে আফগানিস্তানে বাংলাদেশের তরুণরাও লড়তে গিয়েছে। কী ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করলে সেটা আমাদের কাছে 'মৌলবাদ' বলে মনে হবে না? এই কালে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্তমান কালপর্বে শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা কী হবে?

এর উত্তর আমি দেব না। শুধু সকলকে ভাববার আহ্বান জানিয়ে শেষ করবো। শেষ করবো করাচির উম্মত পত্রিকায় ওসামা বিন লাদনের একটি সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে:

> আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আক্রমণের সাথে আমি যুক্ত নই। একজন মুসলমান হিশেবে আমি মিথ্যে কথা যেন বলতে না হয় তার চেষ্টা করি। আমি এই আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং আমি মনে করি নিষ্পাপ শিশু, নারী এবং অন্যান্য মানুষ হত্যা করা কোন প্রশংসা করার কাজ নয়। ইসলামে শিশু, নারী এবং অন্যান্য মানুষ হত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যুদ্ধের সময়ও এমন হত্যাকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই নারী, শিশু এবং অন্যধর্মের মানুষ, বিশেষ করে ইসলামধর্মের মানুষের ওপর এমন হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ মাস ধরে ফিলিস্তিনে যা ঘটছে তাতেই যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের ওপর আল্লাহ্‌র গজব পড়ার কথা। যে সকল মুসলমান রাষ্ট্র এই অত্যাচার নীরবে দেখছে তাদেরও এই ঘটনা দেখে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। এর আগে ইরাক, চেচনিয়া এবং বসনিয়ার নিরপরাধ মানুষের ওপর কী হয়েছে? এই সকল ঘটনায় আমেরিকা এবং পশ্চিমাদের নিস্পৃহতা এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা দেখে একটি কথাই বলা যায় : আমেরিকা একটি ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে মদদ দিচ্ছে। আমেরিকার সাথে মুসলিম বিশ্বের সখ্য নিছক লোকদেখানো এবং প্রতারণামূলক। যুক্তরাষ্ট্র এসব মুসলিম রাষ্ট্রকে একদিকে ভয় অন্যদিকে লোভ দেখিয়ে তার মতো কাজ করিয়ে নিচ্ছে। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন যুক্তরাষ্ট্রের দাস রাষ্ট্রগুলো হয় মুসলমানদের শাসক নয় শত্রু।

# আফগানিস্তানে ইঙ্গ মার্কিন হামলা : জালেম ও মজলুম

আহমেদ আবদুল কাদের*

সর্বপ্রথমে আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের এ আলোচনা সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। আমার জানামতে এটা একটি বিরাট এবং প্রথম উদ্যোগ যেখানে বামচিন্তার পাশাপাশি আমরা যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি, সেই তথাকথিত মৌলবাদীদের এখানে ডাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেরীতে হলেও বোধহয় চিন্তার কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। সেই পুরনো সেকেলে স্টেরিও-টাইপিং প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, মুৎসুদ্দী ইত্যাকার বিভিন্ন শব্দ আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম কত শুনেছি! কিন্তু আজকে দিন পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সেদিনও বলেছিলাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আপনারা যেভাবে বলছেন সেভাবে হবে না, হতে পারে না, হয়নি। সোভিয়েত ভেঙ্গে গিয়েছে, চীন-কিউবা এখন মাথানত করেছে। বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে বস্তুবাদ দিয়ে হয় না। পশ্চিমা সভ্যতার চরিত্র বুঝতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। পুরোপুরি হয়েছি বলব না, কিছুটা সফল হয়েছি, কিছুটা ব্যর্থ হয়েছি। পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে মূলতঃ ইহুদী-খ্রিস্টীয় ও বস্তুবাদের সমন্বিত এক সভ্যতা। এ সভ্যতায় স্বার্থ আছে, বস্তুতান্ত্রিকতা আছে, তার সঙ্গে খ্রিস্টীয়-ইহুদী ধর্মের আধিপত্য বিস্তারের প্রেরণা আছে। উপনিবেশবাদের ইতিহাস পড়ুন ভাস্কোদাগামা কে ছিলেন, কলম্বাস কে ছিলেন, ইসাবেলা কে ছিলেন, ফার্দিনান্ড কে ছিলেন তারা সবাই খ্রিস্টের বাণী বা তাদের ধর্মের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সারা দুনিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাদের সধর্মের অথবা মতাদর্শের আধিপত্য বিস্তার তৎসঙ্গে বস্তুগত শক্তি অর্জন। এর কোন পরিবর্তন হয়নি।

মজহার সাহেব যে প্রবন্ধ উত্থাপন করেছেন তাতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আপনার লেখায় sense of justice আছে। বামদের লেখায় sense of justice খুব কম পাওয়া যায়। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনাদের অনেক বাম চিন্তাবিদদের লেখা কমজোর দু'পৃষ্ঠা পড়ার পরেই একগাদা গালাগালি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। আর তত্ত্ব যা পাওয়া যায় তা বুঝা যায় না। আপনারা সাধারণ মানুষদের নিয়ে চিন্তা

* শিক্ষক, আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা। সহ সভাপতি, ইসলামী ঐক্যজোট।

করছেন, ভাবছেন, সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন, সেই কথাটা সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে। আপনাদের কথা শুনে মনে হয়, আপনারা সাধারণ মানুষের 'চিন্তা-চেতনা' মননের ও তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিরোধী, ঐতিহ্যের বিরোধী, তাদের আত্মপরিচয় রক্ষার বিরোধী। এভাবে কেবল বক্তৃতা করা যাবে, সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না, যেতে পারে না। মজহার সাহেব সম্ভবত একজন ব্যতিক্রম। তিনি চেষ্টা করছেন সাধারণ মানুষের ভাষা বুঝার জন্য, তিনি আজকে উপস্থাপন করেছেন আজকের শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা জেহাদ ও ক্রুসেড। আমি তত্ত্বগত আলোচনায় যাবো না – কেবল প্রকৃত দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সম্ভবত, আমার ধারণা জেহাদ, ক্রুসেড ও শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বগতভাবে এক করে দেখার সুযোগ নেই এটা আপনারা স্বীকার করবেন। তিনি যে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন: মানুষের ভাষা, মানুষের উপলব্ধি, যার জন্য আপনি কাজ করবেন, যে জাতির জন্য আপনি কাজ করবেন, সেই জাতির মানুষ কী বলে। যে জাতির মানুষ হজরত শাহজালালকে ত্রাতা মনে করে, আজকে লোক দেখানোর জন্য হলেও আমাদের নেতা নেত্রীদের তাঁর দরবারে হাজিরা দিয়ে তারপর নির্বাচন শুরু করতে হয়, সেই শাহজালালকে বিচ্ছিন্ন করে যারা বক্তৃতা করেন সাধারণ মানুষ তাদের বক্তৃতা গ্রহণ করবে না। ফরহাদ মজহার সম্ভবত সেই উপলব্ধিটাই অর্জন করেছেন এবং তাঁর সহ-পথযাত্রীদের মধ্যে এ কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন, আমি তাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই।

সুধীমণ্ডলী, ১১ সেপ্টেম্বর সৌভাগ্যবশত আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। ১১ সেপ্টেম্বর এর পর আমি যে পেনিক স্বচক্ষে দেখেছি তা ভোলার মত নয়। সুপার পাওয়ার যে এত পেনিকগ্রস্ত হতে পারে এটা অকল্পনীয়। কাজেই মনে রাখতে হবে – সুপার পাওয়ারকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। যদি সঠিক স্ট্র্যাটেজী নির্ধারণ করতে পারি, তাহলে এই সুপার পাওয়ারের মোকাবিলা করা সম্ভব। আর এটা করতে হলে আপনাদেরকে ১০০ মিলিয়ন নির্যাতিত মানুষ তৎসঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকার এবং প্রাচ্যে আরও বহুকোটি মানুষ আছে তাদেরকে একত্রিত করে এ লড়াইকে পরিচালিত করতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে পবিত্র কুরআনে করিম দুটো শব্দ ব্যবহার করেছে এই সংগ্রামকে বোঝাবার জন্যে : একটি মুসতাকবিরীন আরেকটি মুসতাদয়াফীন। মুসতাকবিরীন এর শাব্দিক অর্থ দাম্ভিক, অহংকারী, আধিপত্যবাদী আর মুসতাদয়াফীন এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যাদেরকে দমিয়ে রাখা হয়েছে, দুর্বল করে রাখা হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে। কুরআন আহ্বান করেছে, তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা ঐ মুসতাদয়াফীন এর পক্ষে লড়াই করছ না কেন? তার মানে সংগ্রামটা হচ্ছে মূলত কুরআনের দৃষ্টিকোণ হতে মুসতাদয়াফীন শ্রেণীর পক্ষে মুসতাকবিরীন এর বিরুদ্ধে। এটা হচ্ছে কুরআনের মর্মার্থ, কুরআনের শিক্ষা। যদি আপনারা-আমরা দুঃখী মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করতে চান, তাহলে তাদের পক্ষে ঐ ভাষায় সংগ্রাম করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বিবেচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মুসতাকবিরীন শক্তির প্রতিভূ। আর তাবত মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার মানুষ হচ্ছে মুসতাদয়াফীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরেকটা কথা প্রসঙ্গত আসে মিডিয়া কিন্তু সবটাই ডান দেশ থেকে আসে, বামরা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐ মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত। অস্বীকার করে লাভ নেই তারা যে ভাষায় কথা বলে আপনারাও সে ভাষায় কথা বলেন, তারা মৌলবাদকে গালি শিখিয়েছে। মৌলবাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মৌলবাদ মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রটেস্টেন্ট ধর্মীয় আন্দোলন। পঞ্চাশের দশকের পরবর্তীতে ইরানের বিপ্লবের পরে সত্তর দশকের শেষে আশির দশকে এসে এ কথার লেবেলটি ইসলামের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের ঘায়েল করতে হলে কথায় কথায় মৌলবাদী বলা হয়। নতুন শব্দ হলো টেরোরিজম। টেরোরিজম আগেও ছিল, এখনও আছে পৃথিবীতে। হঠাৎ করে আবিষ্কার হয়ে গেল ইসলাম আর টেরোরিজম সমার্থক। কেন হল? কারণ টেরোরিস্ট রাষ্ট্র ইসরাইলকে বসিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্র বানাবার সহযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ প্রায় সবাই সামিল ছিল, কেউ ব্যতিক্রম ছিল না। এদের টিকাতে হলে এদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করবে তাদেরকে লেবেলাইজড করতে হবে। এ আবিষ্কারটি হচ্ছে টেরোরিস্ট। এবং এই ঘটনা প্রবাহ শেষ পর্যন্ত এসে লাদেন পর্যন্ত ঠেকেছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছে ফরহাদ মজহার সাহেব বলেছেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা টেরোরিস্ট, ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলা টেরোরিজম অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে আজকে সুকৌশলে টেরোরিজম বলে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। দুর্ভাগ্য হলো আমাদের পৃথিবীর সবক'টি মোড়ল রাষ্ট্র রাশিয়া-চীন-জাপান সহ আর ইউরোপতো আছেই সবাই আজকে বুশের ইমামতিতে, নেতৃত্বে তাবৎ দুনিয়ার মজলুম মানুষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আফগানদের লড়াই হচ্ছে প্রতীকী লড়াই, আপনারা তালেবানদের কথা বলতে পারেন, যে কথা আগেও আলোচিত হয়েছে, তাদের নারীদের কথা বলতে পারেন। আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই কিন্তু নিছক তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়। এই লড়াই নিছক ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্য নয়। এ একদিকে হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য লড়াই, তৎসঙ্গে পশ্চিমা-পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জকারী শক্তি যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, সারা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবার জন্য একটি লড়াই এবং এই যুদ্ধে বুশ সফল হয়েছেন কারণ ইতিমধ্যে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র নতিস্বীকার করেছে। আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, টেরোরিজমের সমস্যা নিয়ে। এখন পৃথিবীর যেখানেই সংগ্রাম হবে ভারতে সংগ্রাম হচ্ছে, বসনিয়াতে হচ্ছে, এমনকি চীনে হচ্ছে, ফিলিস্তিনে হচ্ছে সবগুলোকে এখন টেরোরিজম বলে। স্বাধীনতার দাবী করা যাবে না। আধিপত্যবাদীর বিরুদ্ধে কথা বললে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে, আজকে আমি আপনি টেরোরিস্ট বলে আখ্যায়িত হব – এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আজকে দেশের মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। মতাদর্শ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

প্রিয় বন্ধুরা, আরেকটি কথা আপনারা জানেন হান্টিংটনের কথা আজকে আলোচনায় আনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হান্টিংটন সাহেব একজন ইহুদী, তিনি চেষ্টা করেছেন পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মুসলিম দুনিয়ার এবং তার সঙ্গে চায়নাকে যোগ করে একটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিকে স্থায়ীভাবে জিইয়ে রাখার জন্য। আমি স্বীকার করি আমরা পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষতিকর ও অমানবিক দিক উৎখাত করতে চাই। কিন্তু যেকোন সভ্যতার একটি ইতিবাচক দিক থাকে। তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়, ইসলামেরও লড়াই নয়। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিষয়কে গোটা মানব জাতির উত্তরাধিকার মনে করে। হাদিসে বলা হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বা ইজমা হচ্ছে মুমিনের হারানো সম্পদ, মুমিনরা তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তবুও আমাদের দেশে কিছু লোকজন বলে দেশটাকে তারা ১৪০০ বছর আগে নিয়ে যেতে চায়। তার মানে আমরা যারা কথা বলি তারা ১৪০০ বছর পরের জিনিসটা জানি না বলেই তারা আখ্যায়িত করতে চায়। প্রিয় বন্ধুরা, আধুনিকতার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলেছি না। আধুনিক যুগের সুফলগুলোকে আমরা কিন্তু ধরে রাখারও পক্ষে। আমরা তার ক্ষতিকর, অমানবিক, মানব জাতির স্বার্থবিরোধী জিনিস প্রতিকার করতে চাই। আধুনিক উত্তর যুগে এসে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তার সবকটির সাথে আমরা একমত নই আবার তার সবকটিকে আমরা নাকচ করে দেয়ার পক্ষে না। আমরা যে কথা বলার চেষ্টা করি তা হচ্ছে এই স্টেরিওটাইপিংটা পরিবর্তন করতে হবে। তাত্ত্বিকদের বড় সমস্যা হচ্ছে they become oversimplified. দুনিয়াটা কমপ্লেক্স বিধায় এখানে খুবই সহজ সরলীকরণের মাধ্যমে কোন ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রয়োগের দিক থেকে তা মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।

অতএব, আমি কথা আর দীর্ঘ করতে চাই না, শেষে যে কথা ক্রুসেডের প্রসঙ্গ, জেহাদের প্রসঙ্গ আর সন্ত্রাসের প্রসঙ্গে আসছি। ক্রুসেডের কথা আপনারা জানেন, সেটা আলোচনা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে, মুসলমানদের সঙ্গে যে ক্রুসেড হয়েছিল দ্বাদশ শতকে, একাদশ শতকে, সেটা আপনারা কমবেশী জানেন। "জেহাদ" কিন্তু নিছক একটা বস্তুতান্ত্রিক বিষয় নয়, আবার নিছক ভাবগত বিষয়ও নয়। যারা গোটা ইসলামকে ভাববাদী বলে নাক সিটকাতে চান তারা ইসলাম সম্পর্কে মোটেও জানেন না। আর যারা ইসলামকে তার ভাবগত দিকটা পরিহার করে নিছক বস্তুতান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত করতে চান তারাও পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। ডেনিয়েল পাইন, আমেরিকার একজন উগ্র মুসলমান লেখক, তিনি এই ইসলামী আন্দোলনগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, এটা তেলের কারণে হয়েছে। তেল থেকে টাকা পয়সা পাওয়া গিয়েছে আর সৌদি আরব এই তেলের পয়সা দিয়েছে ফলে সারা দুনিয়ার ইসলাম জেগে উঠেছে। মুসলমানদেরও কিছু বুদ্ধিজীবী আছে, এদেশেও আছে, যারা এরসঙ্গে যোগসূত্র করার চেষ্টা করেন। কথাটা পুরো ঠিক নয়। বস্তুগত সুবিধা থাক আর না থাক একজন মুসলমান জেহাদ করার প্রয়োজন বোধ করে। আফগানিস্তানের গরীবদুঃখী মানুষগুলো জেহাদ করছে কেন? টাকার জন্য না এই বিশ্বাসের জন্য?

বিশ্বাস ভুল কি শুদ্ধ এই প্রশ্ন আপনি তুলতে পারেন, কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ সম্ভবত নেই। এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এখানকার তরুণরা সেখানে গিয়েছে যুদ্ধ করার জন্যে; কিসের জন্য? আপনি হয়তো অনেক কথা বলবেন। হঠকারিতা বলবেন, পাগলামী বলবেন, অনেক কথা বলতে পারেন। কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন না এককালে আপনারা চে গেভারার চিন্তাভাবনা নিয়ে অনেক উৎফুল্ল ছিলেন। 'ডাক দিয়ে যাই' বলে অনেক চটি বই আমরা স্কুল জীবনে, কলেজ জীবনে পড়েছি। আজকে 'চে' এর যুগ নয়। আজকে নতুন একযুগ শুরু হয়েছে। সেই যুগের ভাষা ইসলামের ভাষা, জেহাদের ভাষা। সেই যুগের শব্দ আল্লাহতে বিশ্বাস বা তাওহীদ। তাওহীদ পরিহার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যেতে পারে কিন্তু এর শেষ ফল ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই প্রিয় বন্ধুরা আমার, আমি জানি এই মুহূর্তে আপনারা অনেকে হয়তো আমার সাথে একমত হতে পারবেন না তবে অপেক্ষা করতে হবে। দুনিয়া কিন্তু ইতিহাস গড়ে যাচ্ছে। এ লড়াইয়ে যদি জিততে হয়, যদি আপনারা বিশ্বাস করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বর্তমান দুনিয়ার মানবতার মূল দুশমন, তাহলে ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তত্ত্বগত কিছু নিয়ে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা একটা Common Platform-এ একত্রিত হতে পারি এবং সে Platformটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতাকামী মানুষগুলোর যারা প্রতিপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে চায়, আমাদের ভূগোলকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। আমরা লড়াই করতে পারি এদের বিরুদ্ধে।

তত্ত্বের মাধ্যমে যেমন বিপ্লব করা যায় না, আবার তত্ত্ব পরিহার করেও বিপ্লব করা যায় না। দুটোর সমন্বয়ের প্রয়োজন। আসুন আমরা চেষ্টা করি। তত্ত্বে আপনাদের ও আমাদের কিছুটা পার্থক্য হতে পারে কিন্তু সম্ভবত লক্ষ্যে আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যেদেশে বাস করছি সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা, দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা। যার জন্য আপনি সংগ্রাম করছেন সেই সাধারণ মানুষ কিন্তু কষ্ট করে হলেও রোজাটা রাখেন আর যার বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম করছেন তিনি ইফতার পার্টি সাজিয়ে বসেন, রোজা কিন্তু রাখেন না। জনগণের এই বিশ্বাসকে মূল্য দিতে হবে। অন্তত শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে এ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করা না শিখলে এ আন্দোলন করা যাবে না। দেশের মানুষের উন্নয়ন করা যাবে না। আমি বিশ্বাস করি ডায়ালগ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সম্পর্কে আপনাদের অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে, আপনাদের সম্পর্কে আমাদের মহলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমরা এক কথায় জানি কমিউনিস্ট মানে নাস্তিক। আর আস্তিক কখনো নাস্তিকের পক্ষ নিতে পারে না। এটা সবাই বুঝি। অন্যদিকে আপনাদের ধারণা হচ্ছে যারা ইসলামের কথা বলছে তারা সেকেলে, দানবীয়। কিছু কিছু পত্রিকাও আমাদের সম্পর্কে লেখে: আমরা যেন দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর, আমরা নারীদের তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে অসূর্যম্পশ্যা বানাতে

চাই, শিক্ষা বন্ধ রাখতে চাই। এসব কথা আপনারা শুনে থাকবেন। আমি মনে করি ডায়ালগ যদি ওপেন হয় তবে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। এবং আমাদের সমস্ত ভুল আপনারা বুঝবেন, আপনাদের ভুল আমরা বুঝবো।

আমি শেষে বলতে চাই ইসলাম কিংবা যে কোন আদর্শ থেকে আমরা দুধরনের ব্যাখ্যা পাই। একটা হলো hard line interpretation এবং আরেকটা moderate interpretation। আজকে তালেবানরা যা করছে তা হলো কোন কোন ইস্যুতে ওদের hardline interpretation. দেশের এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কিন্তু তাদের এই hardline interpretation এর সাথে একমত হন নাই। কাজেই এটা মনে রাখতে হবে জিনিসটাকে ধারণ করতে পারলে আপনি interpretation change করতে পারবেন। যদি আন্তরিকতা, সহানুভূতি থাকে যদি আমরা সবাই কথা বলি, ডায়ালগ করি তাহলে আমরা যাকে বলি সিরাতুল মুস্তাকিম সেই পথটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু একজন hardliner এর কোন কথা শুনে আপনি গোটা জিনিসটাকে generalize করে দিলেন তো মারাত্মক ভুল হবে। ঠিক সেরকম আপনাদের মধ্যে যে উগ্রতা আছে, হঠকারিতা আছে, সেটাও মনে রাখতে হবে, নাহলে এটা কিন্তু ক্ষতিকর হবে। আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করবো না। Dialogue open করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে তা অব্যাহত থাকুক, আমরা যেন পৃথিবীর মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বাঁচাতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ।

## পুস্তক নির্দেশ

আহমদ আবদুল কাদের, *ইসলামী আন্দোলন: জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই*, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৫।

# 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম' প্রসঙ্গে

রেহনুমা আহমেদ*

১

বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে, এই ঘরে আমরা সকলে দ্বিধান্বিত। সকলেই দ্বিধান্বিত। নানা ধরনের দ্বিধা। একটি দ্বিধা আমি প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই স্পষ্ট করার জন্য। আমার পূর্ববর্তী বক্তা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন। কাদের ভাইয়ের সঙ্গে আমি বহু বিষয়ে একমত। যখন তিনি এই দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের কথা বলছেন এবং একাত্ম হবার কথা বলছেন – এই বোধ এবং অনুসন্ধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

মাথায় রাখা জরুরি যে, পুঁজিবাদ সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, এ্যালিয়েনেশন ঘটায়, ফ্র্যাগমেন্টেশন ঘটায়। কিন্তু একই সাথে কিছু বিরোধ – এই দেশের ইতিহাসের বিরোধ – আমার মনে হয়, আমাদের অনেকেরই মাথার সামনে চলে আসে। এটা আমি উচ্চারণ করতে চাই। সংলাপের জন্য সেটা প্রয়োজন। আলোচনা থেকে মনে হতে পারে ইসলাম অখণ্ড এবং অভিন্ন। এই ধারণা হয়তো বা তৈরী হয়েছে যেটা, আমরা সকলেই জানি, সত্য নয়। '৭১ নিয়ে আমি কথা বলতে চাই আপনারা হয়তো অনেকেই তা বুঝেছেন।

উদারনৈতিক ইতিহাস চর্চা '৭১-কে স্থাপন করে ধর্ম বনাম ধর্ম-নিরপেক্ষতার লড়াই হিসেবে। এই বিষয়টা আবার অনুসন্ধান করা খুবই জরুরি। কারণ, জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা মনে রাখা প্রয়োজন। ভোলার কোন কারণ নেই সপ্তম বহরের অবস্থান। এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম বহরের অবস্থান জামায়াত এবং পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য সহযোগিতা এবং শক্তি প্রদান করেছে – এটা ভোলার কোনও কারণ নেই। আবার একই সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে, জামায়াতে ইসলামকে 'রাজাকার' হিসেবে লেবেল করা হলে পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কাছে আবার আপন হয়ে গেল? সংলাপের মাধ্যমে, আত্ম-

* গবেষক। সাবেক শিক্ষক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধগুলোর মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে: কোনও একটা লেবেল দিয়ে বিষয়টা বোঝা যাবে না। সেটা 'মৌলবাদ' হোক বা 'সাম্রাজ্যবাদ' হোক, কিংবা 'মৌলবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ' হোক। খেয়াল রাখা দরকার, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে, তথা আরব অঞ্চলে মডারেট ইসলাম নামে যাকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে তা মার্কিনের চেলা ছাড়া আর কিছুই না। সৌদি আরবের রাজতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর চেলা, মিশরের সরকারও তাই। তাই বলছি, ইসলাম অখণ্ড কিছু নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানিক ইতিহাস আছে, যে স্থানিকতা আবার এই বিশ্বায়নের যুগে স্থানিক নয়। '৭১-এই সেটা স্পষ্ট। যে নিপীড়ক এই অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে তা সপ্তম বহরের উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব ছিল না। এই হচ্ছে আমার প্রাক্ কথন।

মূল আলোচনায় চলে আসি। আয়োজকরা যখন আমায় আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন আমি জিজ্ঞেস করি শিরোনামে 'শ্রেণীসংগ্রাম' কেন? আমি যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, তাঁরা বলেছিলেন – মূল বিষয়টা শ্রেণীসংগ্রামের কিনা, সাম্রাজ্যবাদ কিনা – এগুলো তাঁরা উত্থাপন করতে চাইছেন। ফরহাদ মজহার তাঁর বক্তব্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন। বহু বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত, কিন্তু ভিন্নতাও আছে। এই ভিন্নতাকে আমি দুটো বিষয় হিসেবে দাঁড় করাতে চাচ্ছি। আমার একটি অস্বস্তির জায়গা 'শ্রেণীসংগ্রাম'। তিনি বলেছেন, বর্তমান যুদ্ধ মূলত তেলের লড়াই, পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত তেলের সভ্যতা। যদিও ফরহাদ মজহার বলেছেন যে, মার্ক্সবাদীরা খুব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়গুলোকে দাঁড় করিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তেলের যুদ্ধ বলাতে তাঁর কথার মধ্যেও একটা স্ববিরোধিতা রয়ে গিয়েছে। আমি যেভাবে মার্ক্সবাদ বুঝি তা হচ্ছে, পুঁজিবাদ সামাজিক সকল সম্পর্কের মধ্যে অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং যার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক রূপান্তর/বদল ঘটে। এই সামগ্রিকতা বিবেচনায় রাখা জরুরি।

বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য-অপাশ্চাত্য বিভেদরেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভেদ, কোনও সরল অর্থে বলছি না, একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া এবং এই সময়কালে ইউরোপীয় দেশগুলো সারা বিশ্বকে তাদের সাম্রাজ্যে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। তাই যুদ্ধটা বহুদিনের, এই বিশেষ মুহূর্তের নয়। আমরা সুবিধাভোগী মানুষজন এই যুদ্ধটা টের পাই না, যুদ্ধের আঁচড় আমাদের গায়ে লাগে না। এর মানে এই নয় যে, বর্তমান আফগানিস্তান যুদ্ধের বিশেষত্বকে আমি কোনওভাবে অস্বীকার করছি। কিন্তু আমার মনে হয় একটা জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে, সেক্যুলার সময়ে 'ক্রুসেড'-এর অর্থ কী? এবং নিঃসন্দেহে বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব, পাশ্চাত্য অধ্যুষিত বিশ্ব হচ্ছে সেক্যুলার। আধিপত্যশীল মতাদর্শ হচ্ছে সেক্যুলার।

কিছু চিন্তাবিদ বলেছেন, পাশ্চাত্য সারা বিশ্বকে তার উপনিবেশে রূপান্তরিত করার একটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় রত। এটাকে ইউরোপীয় প্রকল্প হিসেবে নামকরণ করেছেন তাঁরা যা বিশ্বব্যাপৃত। ক্ষমতা-সম্পর্ক এমনই যে, পাশ্চাত্য স্বার্থে নানান অ-

ইউরোপীয় মানুষজন দালালি করে থাকে এবং এই রূপান্তর আমাদের মজ্জাগত। আমরা পাশ্চাত্যের স্বার্থে নিরন্তর কাজ করি। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপনিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংগঠন, এই রূপান্তরকে সম্ভব করে তুলেছে। পাশ্চাত্যকরণের এই চলমান প্রক্রিয়ায় আমরা অংশগ্রহণ করতে প্ররোচিত, অথবা বাধ্য। আমার মনে হয়, সমস্যা থেকে যায় যদি আমরা যুদ্ধটাকে 'তেলের যুদ্ধ' বলি, সভ্যতাকে 'তেলভিত্তিক সভ্যতা' বলি। এতে আধুনিক বিশ্বে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রক্রিয়া, ক্ষমতার প্রক্রিয়া, ক্ষমতা-সম্পর্ক – এগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। প্রথাগত মার্ক্সবাদীদের সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয়ে থাকে, আর সবকিছু বাদ দিয়ে তাঁরা অর্থনৈতিক সম্পদ এবং মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ফরহাদ মজহার তাঁর বক্তব্যে আধুনিকতা ও প্রগতির সমালোচনা করেছেন। কিন্তু একই সাথে তিনি অর্থনৈতিক সম্পদের গুরুত্ব অন্যভাবে নিয়ে আসছেন – সেখানেই তাঁর সাথে আমার বিরোধ। আমার মনে হয়, মার্ক্স যেভাবে সামগ্রিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বর্তমান শোষণ প্রক্রিয়া বুঝতে তার প্রয়োগ করা জরুরি।

২

ফরহাদ মজহারের বক্তব্য নিয়ে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসছি। তা হচ্ছে লিঙ্গীয় সম্পর্ক। সিএনএন এবং বিবিসি আমরা এ ঘরের অনেকেই দেখে চলেছি। সিএনএন-এ কোন্ ছবিটা বারেবারে দেখানো হয়েছে? 'বিনিথ দ্য ভেইল'। পাশ্চাত্যের কাছে নারী প্রসঙ্গ – তালেবানরা কিভাবে নারীদের নিপীড়ন করছে – তা হচ্ছে তুরুপের তাস। এটা আমাদের বুঝতে হবে। সে কারণেই আমি বলছি, শ্রেণীসংগ্রাম ধারণাটি বিভ্রান্তিকর। একটি সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণী এবং অপরাপর বৈষম্যকে – নারী-পুরুষ বিভাজন, জাতিগত বিভাজন – সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ বিশ্বায়নের যুগে এগুলোই বাস্তব। এখন কথা হচ্ছিল নারী প্রসঙ্গে নিয়ে, এবং নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে।

অনেক চিন্তকই আছেন যাঁরা বলছেন, বর্তমানে পাশ্চাত্য হচ্ছে আধিপত্যশীল ব্যবস্থা। তার অনিবার্য দিক হচ্ছে প্রগতি এবং মানবিকতাবাদ। সে যুক্তি ধরেই আমি অগ্রসর হবো। আমার মনে হয়, আধুনিকতার পাশ্চাত্য যে মডেলকে সভ্য মডেল হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে সেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বেলায় কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সম্পর্ককেই সভ্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য কাম্য ধরে নেয়া হয়। এটাকে প্রশ্ন করতে পারা খুবই জরুরি। আমরা কিংবা বামমহল এভাবে দেখি, পাশ্চাত্য সম্পর্ক হচ্ছে ধর্ম-নিরপেক্ষ সম্পর্ক। এখানে নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী। এই বিশেষ মডেলটি পিউরিটান এবং ইভানজেলিক্যাল আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠা পায়। এর আগে রোমান ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিতে নারী ছিল শয়তান। ইভানজেলিক্যাল এবং পিউরিটান মুভমেন্টের মাধ্যমে নারী হয়ে ওঠে পুরুষের দৃশ্যমান সহযোগী যা ইসলামী ঐতিহ্য থেকে ভিন্ন। যে সম্পর্কগুলোকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সম্পর্ক

হিসেবে মেনে নিই তার খ্রিস্টীয় এবং খ্রিস্টোত্তর ইতিহাস উদঘাটন করা জরুরি। তা না হলে এই সরলীকরণ হবে যে, পাশ্চাত্য আধুনিক মাত্রই ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে: নারীর বস্তুকরণ একান্তভাবে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ব্যাপার। নারীবাদীরা এই সমালোচনা দাঁড় করাচ্ছেন যে, নারীর দৃশ্যমানতা আসলে পাশ্চাত্য পুরুষের পৌরুষ বাড়ানোর জন্য অপরিহার্য।

যদি নারীর উপস্থিতি ছাড়া পাশ্চাত্যের পৌরুষ লাঘবই হয়, তাহলে এইগুলোকে আমদানি করা প্রশ্নবোধক। এগুলোকে প্রগতিশীলতা ভাবা প্রশ্নবোধক। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দেব, কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে প্রেসিডেন্টের যে বক্তৃতা হয় তা জর্জ বুশ না দিয়ে লরা বুশ দিয়েছিলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল আফগানিস্তানের নারীদের রক্ষা করা। এই রক্ষা করার কাজে যোগদান করেছেন টনি ব্লেয়ারের স্ত্রীও। এই যদি পাশ্চাত্যের ক্ষমতাশালী নারী বা আদর্শ নারীর মডেল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ক্ষমতাশালী নারী মানেই হচ্ছে ক্ষমতাশালী পুরুষকে বিয়ে করা এবং তার সহচর হওয়া। পাশ্চাত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক হচ্ছে প্রগতিশীল, এবং সে কারণেই আদর্শ – এই ধারণা কি তাহলে যথাযথ? অথচ সেটাই তুরুপের তাস। সে কারণেই সংকটটিকে আমি নিরেট শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে দেখার বিপক্ষে।

আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে: এটি একটি দীর্ঘকালীন সংগ্রাম, বিশেষ বিশেষ কালে যুদ্ধের রূপ লাভ করে। নিঃসন্দেহে তেল-গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সর্বাত্মক নয়। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকালীন একটা প্রচেষ্টা চলছে, একটা পাশ্চাত্য প্রকল্প চলমান। হয়তো বা এই বিশেষ সময়ে এই প্রশ্ন উচ্চারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে – কে কোন্ পক্ষে? ধন্যবাদ।

# না ক্রুসেড ও না জেহাদ

সলিমুল্লাহ খান*

১

১৯৭২ সালে আহমদ ছফা লিখেছিলেন: 'আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন আমাদের রক্ত দিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে।' অন্য সময়ে কি আমরা মাংস দিয়ে চিন্তা করি? সম্ভবত না। তবুও বলা যায় এখনও আমরা রক্ত দিয়েই চিন্তা করছি। যুদ্ধ শুধু আফগানিস্তানেই হচ্ছে না। আমাদের ভেতরেও রক্তপাত হচ্ছে।

আমেরিকা ও ইংলন্ডসহ পুরা পাশ্চাত্য জগত আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। সে আক্রমণের বিরোধিতা করতে আমাদের বাধছে কোথায়? আমরা শক্তিহীন বলে? না, আরো কারণ আছে। আমাদের ভয় পাছে আমরা তালেবানের – তথা ইসলামের – সমর্থক হওয়ার অপবাদ পাই। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ভয়ের একটা ইতিহাস আছে। আসলে কি আমরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বলেই ইসলামকে ভয় পাই, না ইসলামকে ভয় পাই বলেই সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবহন করি? আজ এই প্রশ্ন আমাদের তুলতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের ভদ্রলোক সমাজে যে পিছুটান তার বিচার প্রয়োজন। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুখে বলেন অথচ ইসলামের ভয়ে কার্যকর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা গড়তে চেষ্টা করেন না তাদের কাছেও আমার একই বক্তব্য। ফরহাদ মজহার যে জেহাদকে শ্রেণীসংগ্রামেরই একটা বিশেষ রূপ বলেছেন আমি সে কথার সাথে একমত। আমি ইতিহাস দ্বারা আমার বক্তব্য সমর্থন করব। বলব আফিগানিস্তানে বর্তমান পশ্চিমা আগ্রাসনও শ্রেণীসংগ্রামেরই এক ইতর রূপ বিশেষ।

প্রথমে ক্রুসেড সম্পর্কে বলি। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁর সংগ্রামকে 'ক্রুসেড' নাম দিয়েছিলেন। কেন? কিছু পরে আমেরিকার প্রচার বিশারদরা বল্লেন: তাদের সংগ্রাম এসলামের বিরুদ্ধে নয়, শুধু এসলামী ত্রাসনীতির বিরুদ্ধে। তো ক্রুসেড কথার ব্যবহার কেন? ক্রুসেড কী জিনিশ? আমেরিকা দেশের অধ্যাপক ফিলিপ হিট্টি ১৯৩৭ সালে লেখা 'আরব জাতির ইতিহাস' বইতে ক্রুসেডের ভাল সংজ্ঞা দিয়েছেন। হিট্টির

---

* প্রধান সম্পাদক, *রাষ্ট্রসভা পত্রমালা*, বাংলা মটর, ঢাকা।

মতে: "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘর্ষের (interaction) ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ট্রয়ের বিরুদ্ধে গ্রীসের এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে ইরানের পুরাতন যুদ্ধ এই সংঘর্ষেরই প্রথম অধ্যায়ের আগের অধ্যায়। এ সংঘর্ষের মাঝখানকার অধ্যায়ের নাম ক্রুসেড। একালে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টা এই সংঘর্ষেরই সর্বশেষ অধ্যায়।" (১৯৮২: ৬৩৫) হিট্টি সাহেব আরও বলেন: "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দেশভেদ আছে এ কথা সত্য। কিন্তু তাতে কিছু আসতোও না, যেতোও না। দেশভেদ যে গুরুত্ব লাভ করল তার একমাত্র কারণ দুই জগতের ধর্ম, জাতি ও ভাষাভেদ। আরো খোলামেলা যদি বলা চলে তো বলব 'মুসলমান প্রধান' এশিয়ার বিরুদ্ধে 'খ্রিস্টান প্রধান' ইউরোপের আক্রমণের নামই ক্রুসেড। মুসলমানরা ৬৩২ ঈসাবি সালের পর থেকে শুধু সিরিয়া আর পশ্চিম তুরস্কেই (এশিয়া মাইনর) নয়, স্পেনদেশ আর সিসিলি দ্বীপেও রাজ্য বিস্তার করে আসছিলেন।" (১৯৮২: ৬৩৫) ক্রুসেডের অন্যান্য উস্কানির মধ্যে অধ্যাপক হিট্টি উত্তর ইউরোপের টিউটন জাতির লোকদের দেশান্তর গমন আর যুদ্ধজয় মানসিকতার কথাও উল্লেখ করেন। ক্রুসেডের আরও কারণ উল্লেখ করেছেন হিট্টি সাহেব। ১০০৯ খ্রিস্টীয় সালে খলিফা আল হাকিম জেরুজালেমে স্থিত পয়গম্বর ঈসার সমাধিস্থলকথিত স্থানের গীর্জা ধ্বংস করেন। হাজার লক্ষ ইউরোপীয় হাজী এই জায়গায় হজ্জ করতে আসতেন। ৮০০ সালে ফরাসি দেশের বাদশাহ মহাশার্লের (শার্লেমান) কাছে এই গীর্জার চাবি উপহার পাঠান হয়। পাঠিয়েছিলেন জেরুজালেমের প্রধান ধর্মযাজক। তা ছাড়া হজ্জে যাওয়ার পথে বিশেষ পশ্চিম তুরস্ক পার হওয়ার সময় ইউরোপীয় হাজীদের নানা প্রকার জুলুম করা হতো। এইসব ছাড়াও শেষ কারণ হিসাবে হিট্টি সাহেব ধর্মপিতা দ্বিতীয় আরবানের নাম নিয়েছেন।

তখন খ্রিস্টান জগত দুই কেন্দ্রে ভাগ হয়ে গেছে। ১০০৯ থেকে ১০৫৪ সাল পর্যন্ত ঘরোয়া সংগ্রামে খ্রিস্টসমাজের কেন্দ্র রোম ভেঙ্গে নতুন কেন্দ্র কনস্তানতিনের শহর (কনস্তান্তিনোপল, কনস্তান্তিনাবাদ, একালের ইস্তাম্বুল) তৈরি হয়েছে। কনস্তান্তিনাবাদ শহরের বাদশাহ আলেক্সিয়ুস কোমনেনুসের রাজ্য তুরস্কের সেলজুক বংশের রাজারা কিছু কিছু কেড়ে নিচ্ছেন। এই সময় রোমের ধর্মপিতা দোসরা আরবান দুই খ্রিস্টসাম্রাজ্য এক করার সুযোগ দেখতে পেলেন। ১০৯৫ সালে তিনি কনস্তান্তিনাবাদের বাদশাহর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সমগ্র 'খ্রিস্টান জগত' একজোট হয়ে 'মুসলমান জগত'কে আক্রমণ করুক – এই ছিল সেই প্রার্থনার সারাংশ।

এশিয়া খণ্ডের নাম কেন 'মুসলমান জগত' আর ইউরোপ মহাদেশের নাম কেন 'খ্রিস্টান জগত' সে মীমাংসায় যাবার আগে দেখতে পাই ধর্মপিতা দুই নং আরবান ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার একটি বাক্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। তিনি বললেন: "আল্লাহর ইচ্ছা এ যুদ্ধ বাধুক"। লাতিন জবানে মাত্র দুই শব্দে বলা হয়: "দিউস ভুল্‌ত" – "ভগবান চাহেন"। কী চাহেন তিনি? 'শয়তান জাতটার হাত থেকে পবিত্র কবর ছিনিয়ে নাও' – বললেন পোপ মহোদয়। ইতিহাসবিদ হিট্টি লিখছেন 'মানব জাতির সমস্ত ইতিহাসেও সম্ভবত এই বক্তৃতার সমান কাজের বক্তৃতা দ্বিতীয়টি

পাওয়া যাবে না।' (১৯৮২: ৬৩৬) এশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কেন ধর্মের জিগির তুলেছিল তার উত্তর প্রথম ক্রুসেডে পাওয়া গেল। আরবান ডাক দেন ১০৯৫ সালের ২৬শে নভেম্বর। বছর খানেক পর – ১০৯৭ সাল নাগাদ – উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের নরমান ও ফিরিঙ্গি জাতির দেড় লক্ষ যোদ্ধা কনস্তান্তিনাবাদে হাজির। বিনা খরচায় এত বড় বাহিনী গঠনে ধর্মই প্রধান সেনাপতির অধিক ভূমিকা পালন করে। এই ক্রুসেড দুইশত বছর চলে। ইতিহাস ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে সাত থেকে নয় দফা ক্রুসেডের কথা বলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রুসেড কখনও থেমে থাকে নাই। শেষ পর্যন্ত সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ইউরোপ পিছু হটে। খ্রিস্টের দুই জগত – গ্রীক ও রুমী গীর্জা – এক হয় নাই। ঈসাবি ১৬ শতকের গোড়ায় পশ্চিমা খ্রিস্টজগত আরেক দফা বহুধাবিভক্তির মুখোমুখি হয়। ক্রিস্তোবাল কোলনের আমেরিকা আর ভাস্কো দা গামার ভারত আবিষ্কার এই নতুন ক্রুসেডেরই অংশ। এই ক্রুসেডের শেষ পর্যায় এখনও চলছে। সবে পাঁচশ বছর পার হয় হয়। এর মধ্যে কী ভূমিকা পশ্চিম এশিয়ার? একাদশ শতকের ক্রুসেডের সময় মুসলমান জগত একখণ্ড ছিল না। তখন মিসরের ফাতেমিয়া বংশ আর ইরাকের আব্বাসিয়া বংশ লড়াই করছিল ফিলিস্তিনের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য। মাঝখানে সিরিয়া অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য। বর্তমানে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরও ক্রুসেড শেষ হয় নাই। ইতিহাস রসিক পুরুষ। প্রথম ক্রুসেডের সময় ইহুদিরা ছিলেন শয়তানের জাত। এখন তারা দেবতার দলে।

## ২

১০৯৭ সালে কনস্তান্তিনাবাদে সমবেত ধনী গরিব সকল খ্রিস্টান যোদ্ধাই বুকে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাই সে যুদ্ধের নাম ক্রুসেড। ইউরোপে এখনও ক্রুসেড মানে শুধু ধর্মযুদ্ধ নয় জনযুদ্ধও। কাজেই ক্রুসেডকে নিছক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এর জনপ্রিয়তা বা গণ আবেদনের তাৎপর্য কী তাও ভেবে দেখতে হয়। হিট্টির বক্তব্য আমরা শুনেছি। তিনি বলেন ক্রুসেড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী যুদ্ধ (১৯৮২: ৬৩৫) পশ্চিমের কোন কোন অধ্যাপক দেখানোর প্রয়াস পান ক্রুসেড মানে নিতান্ত স্বার্থের সংঘাত, অর্থনৈতিক সংঘাত। ধর্ম এখানে সাধারণ ছুতা মাত্র। (লামন্তে ১৯৪৬) আমরা দ্বিমত করি। ধর্মের নাম নিলে – প্রভু যীশুর মাজার শরীফ দখলের ডাক দিলে – লাখো মানুষ নাচে, তাই ঐ ডাক দেয়া হয়। কিন্তু মানুষ নাচে কেন?

এই প্রশ্নটা আমরা জেহাদের বেলায়ও তুলতে পারতাম। অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের বই পড়েও জানা যায়, জেহাদ এর আরবি মূল ক্রিয়া 'জহদ'। মানে চেষ্টা করা। অধ্যাপক আহমেদ আবদুল কাদের লিখেছেন শব্দটি 'জুহুদ'। (কাদের ১৯৯৭: ৭; ভদ্র ১৯৯৪: ২৮৬) ইতিহাসে জেহাদের অর্থও দাঁড়িয়েছে জনযুদ্ধ। এর সচরাচর বাংলা অনুবাদ ধর্মযুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এর তাৎপর্য কি? ইংরেজের অধীনে থাকার সময় ভারতবর্ষে এই তর্ক বিশেষ উঠেছিল। আমরা তার সার গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

প্রথমে বাংলাদেশের এবং পরে ভারতের অন্যান্য এলাকার রাজা মহারাজারা ইংরেজের হাতে পরাজিত হয় অথবা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। অভিজাত শ্রেণীর একাংশ ইংরেজের সহযোগী হয়, অন্য অংশ ধ্বংস হয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যখন বাংলায় এবং অন্যত্র ভদ্রলোক শ্রেণী – বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুজাতি – ইংরেজের সহযোগিতা করছেন তখন বাংলাদেশের কৃষক সমাজ – বিশেষত মুসলমান কৃষক সমাজ – ইংরেজের ও সহযোগী ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এ লড়াইয়ের নাম তাঁরা দেন জেহাদ। বাংলাদেশে বারাসতের মীর নিসার আলি প্রকাশ তিতুমীর এমনই এক জেহাদের নেতা। তিতুমীরের ভাবগুরু পাঞ্জাব অঞ্চলের সৈয়দ আহমদ বেরেলভি। সৈয়দ আহমেদের সংগ্রাম প্রথমে পাঞ্জাবের শিখ রাজার বিরুদ্ধে চালিত হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের লেখা থেকেও প্রমাণ হয় তাঁর লড়াইয়ের আসল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ কর্তব্য কিনা – এই বিচার পাওয়ার জন্য সৈয়দ আহমদ মক্কা পর্যন্ত সফর করেন। সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের লড়াইকে আজও আমাদের দেশের ভদ্রলোক লেখকরা কিভাবে দেখবেন মন ঠিক করতে পারেন নাই। ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখকরাও এইসব কৃষক বিদ্রোহকে 'পশ্চাদপদ কৃষক চেতনার চিহ্ন' জ্ঞানে বিচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাব এও হতে পারে যে এসব চেতনা অগ্রসর চিন্তারই পূর্বঘোষণা। তা নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার উপর। ইতিহাস অতীত নয়, বর্তমান।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন যাদের বিচারে সমার্থক তাঁরা সৈয়দ আহমদ বা তিতুমীরের স্থান নির্ণয় করতে সফল হবেন না। তাঁদের চোখে এঁদের আন্দোলন বা সংগ্রাম আসল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নয়, তার প্রাগিতিহাস মাত্র। বামপন্থী ভদ্রলোকদেরও সমস্যা এই ধর্ম জিনিসটা। কৃষকরা আন্দোলনের কাজে মসজিদ ব্যবহার করেছেন – কোন কোন ইতিহাস লেখক তা জেনে লজ্জায় ভোগেন। (সেনগুপ্ত ১৯৭৪) বিখ্যাত রণজিৎ গুহ এমন লজ্জা পান না। তবু তাঁর গুরুতর *পরাধীন ভারতে কৃষক বিদ্রোহের গোড়ার কথা* বইয়ে তিনি সৈয়দ আহমদের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা বলতে করেনই নাই। (গুহ ১৯৮৩) গৌতম ভদ্র তিতুমীরের লড়াই নিয়ে গবেষণা করেছেন কিন্তু সৈয়দ আহমদ নিয়ে বিশেষ বলেন নাই। আমার প্রস্তাব তা করা গেলে ভালো হতো। সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে ইংরেজ লেখকরা কী বলেছেন তা আলোচনা করলে জেহাদ কী বস্তু ভালো জানা যায়। সে আলোচনায় অধমর্ণ আমরা রণজিৎ গুহের পদ্ধতি অনুসরণ করব।

অধ্যাপিকা গায়ত্রী চক্রবর্তীর কথা অনুসারে 'সাব অলটার্ন কথা বলতে জানে না' – গরীবের ভাষা নাই। কিন্তু গরীব সম্পর্কে ধনিক যা বলে তা থেকে লুকানো ইতিহাস বের করে আনা যায়। রাজকর্মচারী উইলিয়াম উইলসন হান্টারের নামকরা "আমাদের ভারতীয় মুসলমান" বইটির উপশিরোনাম "তারা কি রাণীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বিবেকের দায়বদ্ধ?"। এই বইয়ের মোট চার অধ্যায়। শেষ অধ্যায়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতি ইংরেজ সরকার কী কী অবিচার করেছে তার একটা

ফর্দ্দ আছে। হান্টার সাহেব মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করেছেন এই দুর্নামও তাঁকে দেয়া হয়। (চৌধুরী ১৩৫৬: ৫) তবে হান্টারের বইয়ের পয়লা তিন অধ্যায়ে মুসলমান সমাজের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মুসলমান তোষণের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। (দে ১৯৯৮:২)পরবর্তী মুসলমান নেতাদের শুভবুদ্ধির তারিফ করার তাড়নায় এই দুরাচার নেতাদের প্রসংগ উত্থাপন করা মাত্র। আবদুল লতিফ বা কারামত আলির ফতোয়ার সাথে তুলনার জন্য আগের ফতোয়ার উল্লেখ করা। শেষের ওই নেতারা ইংরেজ শাসনকে জায়েজ ঘোষণা করেছিলেন। আলিগড় খ্যাত সৈয়দ আহমদ বা চেরাগ আলি প্রভৃতিও এই সহযোগিতা পথেরই পথিক।

অসহযোগীদের নেতা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ। নিজেদের অসহযোগ আন্দোলনকে তারা 'জেহাদ' নাম দেন। 'জেহাদ' শব্দটার প্রতি এ কালের সাম্রাজ্যবাদপন্থী বা সহযোগী ঐতিহাসিকদের ন্যক্কার এমনই তীব্র যে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিধান থেকে এই অধ্যায়টি পুরোপুরি খারিজ করে দিতেও কসুর করেন না। এই আন্দোলন ও সংগ্রামকে নিতান্ত 'সাম্প্রদায়িক' বলেও নিন্দা করা হয়। পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার পর একজন বর্ণহিন্দু পণ্ডিত লিখেছিলেন : "ভারতে ওয়াহাবি-আন্দোলনকে শুধু বিদেশী-রাষ্ট্র-বিরোধী না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মী বা অমুসলমান-রাষ্ট্র-বিরোধী বলাই সংগত।" (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩) শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী মনে করেন: "হয় বল প্রয়োগে বিধর্মী রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া মুসলিম-রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা বিধর্মী রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া কোনো মুসলিম-রাষ্ট্রে গিয়া বাস করিতে হইবে, মুসলমানের পক্ষে এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পন্থা নাই। ইহাই ছিল ওয়াহাবিদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব ওয়াহাবি-আন্দোলনকে ভারতে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না। মুসলমান-সম্প্রদায়কে 'জাতি' আখ্যা দিলে ইহাকে ভারতে মুসলিম-জাতির জাতীয় আন্দোলন বলা যাইতে পারে।" (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩)

বিনয়েন্দ্রবাবুর এই মতবাদ শুধু জনৈক বর্ণহিন্দু ইতিহাস-লেখকের মতমাত্র হলে কথা ছিল না। এই মত 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' ও 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' সকল লেখকেরই। কখনও ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত। এ কালের 'মৌলবাদ' কথাটির মতো 'ওয়াহাবি' কথাটাও গালি মাত্র। সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীরের লোকেরা নিজেদের দলকে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া বলতেন। ঘৃণায় ও ন্যাক্কারে ইংরেজ সরকার সে নাম মুখে আনেন নাই। বর্ণহিন্দু লেখকরাও আনেন না। প্রগতিশীলরাও তাই। তারপরও সত্য গোপন করা সম্ভব হয় না। বর্ণহিন্দু লেখকের লেখা আর একটু উদ্ধার করা যাক। পাঠক বিচার করার অধিকার রাখেন। চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন:

> এই আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কারমূলক হইলেও শুধু ধর্মের সীমানাতে আবদ্ধ ছিল না। আরবদেশে ইহার উৎপত্তি এবং রায়-বেরিলির শহীদ সৈয়দ আহম্মদ ভারতে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মসংস্কারের দিক দিয়া ইহাকে 'পিউরিটান' – আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ধর্মে অনাড়ম্বর সরলতা, বিলাসব্যসন পরিত্যাগ, আর্থিক সাম্য এবং বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ-প্রচারই ওয়াহাবিদের কাজ

ছিল। বিধর্মী শিখ এবং বিধর্মী খ্রিস্টান-রাজশক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই ওয়াহাবিরা ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহারা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ধনীর শত্রুতাসাধন করিয়াছে এবং ইসলাম-রাষ্ট্র স্থাপিত করিতে না পারিলে প্রকৃত মুসলমানের ভারতে স্থান নাই, এই বিশ্বাসে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ চালাইয়াছে। ইহাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ইহাদের ঘাঁটি ছিল; ইংরেজ শাসকেরা ইহাদের শক্তি এবং কর্মকুশলতাকে প্রথম দিকে অবহেলার চোখে দেখিয়াছিলেন। পরে ইংরেজদের আদালতে বিচারকালে ইহাদের কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেকের চোখ খুলিয়া গিয়াছিল। বিধর্মী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইবার জন্য সারা দেশের মুসলমানের নিকট হইতে ইহারা এক প্রকার খাজনা আদায় করিয়াছে এবং ধনী মুসলমানেরা, বিশেষ করিয়া চর্মব্যবসায়ী মুসলমানগণ, ইহাদের অর্থ সাহায্য করিয়াছে। ১৮৩০ সালে ইহারা পেশোয়ার দখল করে। এই সময় বাংলাদেশেও চব্বিশ পরগণায় ওয়াহাবি তিতু মিঞার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান চাষীরা জমিদারি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। এই কৃষক-অভিযানে চব্বিশ পরগণা, নদিয়া এবং ফরিদপুর একরূপ বিদ্রোহীদের হাতে চলিয়া যায়। ইহারা গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে, লুটপাট করিয়াছে, কোনো কোনো জায়গায় গোরক্তে মন্দির কলুষিত করিয়াছে এবং সর্বশেষে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান হইয়া মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। যেসমস্ত মুসলমান ইহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে রাজি হয় নাই তাহাদের শাস্তিবিধান করিয়া তাহাদের মসজিদ পর্যন্ত ইহারা পোড়াইয়াছে। (চৌধুরী ১৩৫৬: ২-৩)

এই বিবরণীর প্রত্যেকটি শব্দ যদি সত্য হয় তবে ঘোর লাগে 'জেহাদ' কী বস্তু? ধনীর বিরুদ্ধে গরিবের, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর, বিধর্মীর বিরুদ্ধে মুসলমানের, জমিদারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান প্রজার, নারাজ মুসলমানের বিরুদ্ধে জেহাদী মুসলমানের – সকলের বিরুদ্ধে সকলের লড়াই? বিনয়েন্দ্রবাবু মনে করেন: "ওয়াহাবিরা মোটের উপর ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে ছিল একথা সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি ইসলাম-নিয়ন্ত্রিত হইতেই হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান সাধনা।" (চৌধুরী ১৩৫৬: ৩) সৈয়দ আহমদের মুরিদরা বৃটিশ কোম্পানীর শাসনাধীন ভারতবর্ষকে 'দারউল হার্ব' ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় একেই বলে 'স্টেট অব নেচার' বা সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধচিহ্নিত 'স্বাভাবিক দেশ'। স্বভাব শব্দের অর্থ যুদ্ধও হয়, শত্রুও হয়। অন্ততঃ এই স্থলে। তার বিপরীত অবস্থার নাম সভ্য দেশ বা সিভিল সোসাইটি। দারুল আমান বা দারুল ইসলাম শব্দেরও একই অর্থ। সৈয়দ আহমদের অনুসারীগণ সভ্যতার শাসন কায়েম করার জন্য লড়ছিলেন। তাঁদের চোখে সভ্যতা ও ইসলাম একার্থক শব্দ। গোলমালটা এই জায়গায়। সভ্যতা ও ইসলাম একার্থক, কিন্তু এক শব্দ নয়। এই গোলমাল ভাবের নয়, ভাষার। তবে ভাষার ওপারে ভাবও নাই। ভাবের বাসা ভাষায়। গণ্ডগোলটা মেটাফর ওরফে রূপকথার। সাম্প্রদায়িকতা মেটাফর নির্ভর। ইতিহাসে তার আরও নজির পাওয়া যায়।

৩

যখন ভারতে জাতীয় আন্দোলন জেহাদের রূপ ধারণ করেছিল তখন জাতীয় আন্দোলনকারীদের নাম হয় ওয়াহাবি। পরবর্তী সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির রূপ গ্রহণ করে তখন তাদের নাম হয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। এই দুই পর্যায়ের তুলনায় অনেক উপকারী কাজ হবে। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি জনসাধারণকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে বাধ্য ছিল, তারা ভদ্রলোকের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু জেহাদী আন্দোলন ছিল কৃষক সমাজে বিস্তৃত এবং সরাসরি বিদেশী শাসন বিরোধী। ১৮৬৪-র পর চারদফা বিচার হয়েছে এই জাতীয় বিপ্লবীদের। সেই বিচারের নথিপত্র অনুযায়ী উইলিয়াম হান্টার বিখ্যাত প্রচার প্রবন্ধ – আমাদের ভারতীয় মুসলমান – মুসাবিদা করেন। হান্টারের বয়ান অনুসরণ করলেই বোঝা যায় তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সারা ভারতের মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলন চরিত্রে কৃষক বিদ্রোহ। এর ব্যাপ্তি পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম অবধি। ওয়াহাবি বিপ্লববাদীরা লড়াই করেছেন উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে কিন্তু তাদের টাকা আর যোদ্ধা গিয়েছে সারাদেশ থেকে।

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে তালেবানরা এখন লড়াই করছেন তাদের সাথে ওয়াহাবিদের অনেক মিল চোখে পড়ে। তালেবানদের সম্পর্কে মার্কিন প্রচারে আমাদের দেশের মার্কিন বন্ধুরাও মজেছেন। আমেরিকার অন্যায় যুদ্ধ যারা সমর্থন করেন, যারা বলছেন তালিবানদের হত্যা করা দরকার, আমি তাদের তারিফ করি। তবে যারা আফগানিস্তানের জন্যে দুঃখ করছেন অথচ মার্কিন আগ্রাসনের চরিত্র বুঝতে সক্ষম নন, কৃষক বিদ্রোহের ভাষায় তারা বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক। কৃষক বিদ্রোহীদের চৈতন্যে তারাও সমান ন্যাক্কার পাওয়ার যোগ্য। (গুহ ১৯৮৩:১৯৯-২১৯)

উইলিয়াম হান্টারই ভালো সাক্ষী। তিনিই বরং শেষ কথা বলুন কেমন বিপ্লবী ছিলেন ওয়াহাবিরা। শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসই মানব জাতির ইতিহাস – অন্তত আমাদের জানা ইতিহাস – বলেছিলেন কার্ল মার্কস। সেই বিচারে জাতীয় আন্দোলনও শ্রেণীসংগ্রামেরই এক বিশেষরূপ। এই রূপে একগুচ্ছ শ্রেণী আরেকগুচ্ছ শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ে। জাতীয় সংগ্রামে একইপক্ষে দেশী ও বিদেশী শক্তি জোট বাধতে পারে। অপরপক্ষেও তাই। তবু সেই লড়াইয়ের চরিত্র মার্কস প্রস্তাবিত শ্রেণীসংগ্রামের বিধি বহির্ভূত হয় না। এই প্রস্তাব নারী আন্দোলন বা অন্য কোন পীড়িত, মজলুম শক্তির আন্দোলনের বেলায়ও কার্যকর। ওয়াহাবি আন্দোলনকে আমরা যে তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া বলি না, তার কারণও এই শ্রেণীসংগ্রামই। এই ভাষার মধ্যেই শ্রেণীসংগ্রাম জারি আছে। দেখা যাক ইংরেজ কর্মচারী মহাত্মা হান্টার কোন প্রকারে তার ক্রুসেড অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ জেহাদ চালিয়েছিলেন। হান্টার লিখেছেন:

> পাঞ্জাব সীমান্তের বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ। (তিনি ছিলেন রায়বেরিলির বাসিন্দা। ১২০১ হিজরির মুহররম মাসে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়) যাদেরকে আমরা পিন্ডারী শক্তির নির্মূলকালে অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতময় ছড়িয়ে

দিয়েছিলাম তিনি ছিলেন সেই সাহসী ব্যক্তিদের অন্যতম। একজন মশহুর দস্যু সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ। বহু বৎসর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলোর উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখশক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চলসমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে সকল মুসলমান দস্যুর পক্ষে নিজের পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তার উপর শিখদের অত্যধিক হিন্দুয়ানিতে উত্তর ভারতের মুসলমানদের ধর্মান্ধতা আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ বুদ্ধিমানের মতো নিজেকে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর একজন মশহুর আলেমের নিকট (শাহ আবদুল আজিজ ১৭৪৬-১৮২৩) শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যেসব অনাচার বা বেদায়াত ঢুকে পড়েছে, সেগুলোর প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাংগামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। (হান্টার ১৯৭৪: ৪ অনুবাদ সংশোধিত)

হান্টার আরো জানাচ্ছেন:

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চল সফর করে ফিরলেন। তখন তার মুরীদান তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করে সাধারণ নফরের মতো তাঁর খিদমত করতো এবং বহু দেশমান্য আলেম খিদমতগারের মতো খালি পায়ে তাঁর পালকির দুধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। পাটনায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের ফলে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা এতোদূর বেড়ে গেল যে, একটা সাধারণ সরকারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়ে পড়লো। তাঁর সফরকালে যেসব শহর পথে পড়তো সেগুলোতে নায়েব পাঠিয়ে তিনি তেজারতি থেকে জাকাত সংগ্রহ করতে লাগলেন। মুসলমান বাদশাহদের সুবাহ্‌দার নিযুক্ত করার মতো হুকুমনামা জারী করে তিনি চারজন খলীফা ও একজন বড় খতিব নিযুক্ত করলেন। এভাবে পাটনায় একটা স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে গংগানদীর গতিপথ বেয়ে এবং পথিমধ্যে বড় বড় শহরে অসংখ্য মুরীদ ও তাদের নায়েব নিযুক্ত করে তিনি কলকাতার দিকে রওয়ানা হলেন। কলকাতায় সাধারণ মুসলমানেরা তাঁর কাছে এমনভাবে দলে দলে জমায়েত হতে লাগলো যে, প্রত্যেকের হাতে হাত দিয়ে বয়েত দান করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। তখন তিনি মাথার পাগড়ি খুলে জমায়েতে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন যে কেউ তাঁর পাগড়ি ছুঁয়ে দেবে সেই তাঁর মুরীদ হয়ে যাবে। ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান এবং এভাবে তার পূর্বতন দস্যুবৃত্তি হাজীর পবিত্র আলখাল্লায় বেমালুম ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। সেখানেও ধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা কলকাতার মতোই সাফল্যমণ্ডিত হলো; কিন্তু ইঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এই প্রেসিডেন্সি শহরের চেয়ে আরও উর্বর ক্ষেত্র এই দস্যু-দরবেশের অপেক্ষায় ছিল। উত্তর ভারতে ফেরার পথে বেরেলি জেলার তাঁর জন্মপল্লীতে এক বিরাট হাংগামাবাজ অনুচরের দল তাঁর সহগামী হলো। ১৮২৪ সালে তিনি পেশোয়ার সীমান্তের বুনো পাহাড়িয়াদের মধ্যে উদিত হয়ে সরাসরি পাঞ্জাবের সম্পদশালী শিখ শহরগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। (হান্টার ১৯৭৪: ৪-৬ অনুবাদ ঈষৎ পরিবর্তিত)

৪

জার্মানীর ১৬শ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ, ১৭ শতকে ইংলন্ডের পিউরিটান বিপ্লব এবং চীনে ১৯ শতকের তাইপিং বিদ্রোহের ইতিহাসও একই চরিত্রের। আমরা যে এই সব বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ইতিহাস এখন যত পারি তত কম জানার সংগ্রাম করছি তাকে যদি শ্রেণীসংগ্রাম না বলি তো শ্রেণীসংগ্রাম কি গাছে ধরে না বাঁশে ধরে? আমরা চাই বা না চাই শ্রেণীসংগ্রাম দীর্ঘজীবী হয়েছে। মজার ব্যাপার ২১ শতকের গোড়াতেও এই সংগ্রাম পৃথিবীর ছাদ ওরফে পামীর মালভূমি বরাবর আবার জেহাদ নামে দেখা দিয়েছে। ফরহাদ মজহার জেহাদকে জেহাদ বলে সঠিক কাজটিই করেছেন। জেহাদই এখানে শ্রেণীসংগ্রামের, কৃষক যুদ্ধের রূপক। মাও জে দং ভুল বলেন নাই যখন তিনি দুনিয়ার শহরের বিরুদ্ধে দুনিয়ার গ্রামের লড়াইকে শ্রেণীসংগ্রামের সমান মান দিয়েছিলেন।

আমরা – আফগান দেশে বা বাংলাদেশে কি দুনিয়ার গ্রাম হয়েই বসে থাকছি না? মাও জে দঙের জেহাদ আর মোহাম্মদ ওমরের শ্রেণীসংগ্রাম এখানেই মিত্রভাব স্থাপন করেছে।

## দোহাই


আহমদ আবদুল কাদের, *জিহাদ কি ও কেন*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৭।

উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আবদুল মওদুদ অনূদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৭৪।

গৌতম ভদ্র, *ইমান ও নিশান: বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়*, কলিকাতা, ১৯৯৪।

ফরহাদ মজহার, 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম', *চিন্তা*, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৫, ২০০১ এবং *রাষ্ট্রসভা পত্রমালা : ২*, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২।

শ্রী বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বিভক্ত ভারত*, কলিকাতা, ১৩৫৬।

Dhurjati Prasad De, *Bengali Muslims in Search of Social Identity 1905-1947*, Dhaka, 1998.

Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, New Delhi, 1983.

Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 10th ed., London, 1982.

John L. LaMonte, 'Crusade and Jihad', in N. A. Faris ed., *The Arab Heritage*, Princeton, N.J., 1946.

K.K. Sen Gupta, *Pabna Disturbances and the Politics of Rent 1873-1885*, New Delhi, 1974.

# উপস্থিত বাদ প্রতিবাদ

**মেসবাহ কামাল**

*অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধের কিছু বিষয়ের উল্লেখ স্বরূপ অধ্যাপক মেসবাহ কামাল তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। "মার্কিনীদের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা আজকে জোরালো কিংবা জঙ্গী কোন আন্দোলনে যাচ্ছে না কারণ তা মৌলবাদের পক্ষে যাবে" – ফরহাদ মজহারের এই উক্তির প্রেক্ষিতে তিনি বলেন – মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এদেশের বামপন্থীরা যখন কিছু বলেন বা করেন তখন তারা তাদের সামর্থ্য ও সাধ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। তবে সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট দৃঢ় না হওয়ায় যতটা ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন তা তাঁরা করতে পারছেন না। পৃথিবীর অন্যত্র যেখানে বামপন্থী দলগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী সেখানে আরও বড় প্রতিবাদ হয়েছে। আমাদের এখানে সীমিত সামর্থ্যের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে মৌলবাদীদের পক্ষে যাবে বলে বামপন্থীরা দাঁড়াচ্ছে না, এ অভিযোগ তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

মেসবাহ কামাল বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলোর সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে 'প্রিন্সিপাল কন্ট্রাডিকশন' এবং 'পেরিফেরাল কন্ট্রাডিকশনের' কথা বলেন। বামপন্থীরা তাদের সকল কর্মকাণ্ড, আলোচনাকে প্রধান দ্বন্দ্বের মধ্যেই সীমিত রাখে, প্রান্তীয় দ্বন্দ্বকে অ্যাড্রেস করে না। অথচ সমাজে অপরাপর সমস্যা যেমন, নারী পুরুষ সমস্যা, পরিবেশের বিশুদ্ধতা রক্ষার সমস্যা – খুঁটিনাটি এসব প্রতীকী সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক ভিত্তিক মার্ক্সবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

শ্রেণীসংগ্রামে ভাষার প্রশ্নে তিনি ফরহাদ মজহারের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন – "জেহাদ ও ক্রুসেডের ভাষা নয়, আমার ভাষাই আমার সংগ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করবে।" তিনি বলেন, মার্ক্সবাদ একটা জীবন্ত বিষয়, আর জনগণের প্রতিদিনের যে সংগ্রাম তার মধ্য দিয়েই নতুন ভাষা, পরিভাষা তৈরি হতে পারে এবং প্রয়োজনে সে ভাষাকে আরও শাণিত করতে হবে।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল তাঁর আলোচনায় চেতনার শ্রেণীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনের চেতনা খোঁজার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে এ যাবৎ সংগঠিত ধর্মাশ্রিত আন্দোলনগুলো শ্রেণীসংগ্রামের একটা অংশ। এগুলো মূলত শ্রেণীসংগ্রামের প্রাথমিক বা চেতনার মাধ্যমিক স্তরকে প্রতিনিধিত্ব

করে। আর শ্রমিক শ্রেণী যখন তার ইডিওলজির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন এটি 'ক্লাস ইন ইটসেল্‌ফ' না থেকে 'ক্লাস ফর ইটসেল্‌ফ' এ রূপান্তরিত হয়। যখন এটি শ্রেণী-দৃষ্টির আলোকে নিজেকে গঠন করে এবং সেই চেতনার আলোকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে তখন নিঃসন্দেহে তা হয়ে ওঠে উচ্চস্তরের চেতনা। মার্ক্সবাদী আন্দোলন সেই চেতনার আলোকে আন্দোলনকে পুনর্বিন্যস্ত করার চেষ্টা করে। তবে তার অর্থ এই নয়, এটা পূর্ববর্তী স্তরের বিভিন্ন আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করে।

বাংলাদেশের বামপন্থীরা মৌলবাদীদের সাথে এক হয়ে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করবে কিনা – এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে মেসবাহ কামাল বলেন, মৌলবাদী ও বামপন্থী উভয়পক্ষ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করলেও উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তা এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও অধিকাংশই হয়তো পুঁজিবাদ বিরোধী নয়। তবে কেউ পুঁজিবাদের বিরোধিতা করলে তাদের সাথে বামপন্থীদের পাশাপাশি লড়াই করার জায়গা হয়তো থাকবে কিন্তু সেক্ষেত্রে সংগ্রামের জায়গাটাও স্পষ্ট করা দরকার বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র না ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র – এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক মেসবাহ কামাল সেমিনারের মূল বক্তা ফরহাদ মজহারের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। কারণ একটি সেক্যুলার সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানকে বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য যে সংগ্রাম চালিত হয়েছিল তা সম্পন্ন হবে।

## আবু মোহাম্মদ খান বাবলু

*মুক্তিযোদ্ধা*

অধ্যাপক মেসবাহ কামালের বক্তব্যের পরই দর্শক সারি থেকে উঠে আসা মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ খান বাবলু আফগানিস্তানে মার্কিন হামলাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য দেন। কারণ তিনি মনে করেন, আফগানিস্তানে এহেন অন্যায় কাজ নেই যা তালেবানরা করেনি। তারা নারীকে অবরুদ্ধ করেছে, পুরুষকে দাড়ি রাখার বিধান দিয়েছে, এমনকি হেরোইন পাচারের মতো জঘন্য কাজও করেছে। অর্থাৎ তালেবানরাই ইসলাম বিরোধী কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে তালেবানদের হত্যা করাই ইসলামসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত কাজ।

## সৈকত হাবিব

*সাংবাদিক, প্রথম আলো*

মুক্ত আলোচনার তৃতীয় বক্তা সৈকত হাবিব বক্তব্য দেন ফরহাদ মজহারের মূল প্রবন্ধের সূত্র ধরেই। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পেছনে ফরহাদ মজহার তেলের সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু সৈকত হাবিব মনে করেন, একে শুধু

তেলের সাম্রাজ্যবাদ বললে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ ইতিহাসের উপর একটা প্রলেপ দেয়া হয় মাত্র, এর পেছনে মুখ্য বিষয় হচ্ছে মার্কিনিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যবাদী মানসিকতা। আর প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মুখ ফসকে 'ক্রুসেড' শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলেছেন বলে যে বক্তব্য ফরহাদ মজহার দিয়েছেন, এর বিরোধিতা করে তিনি বলেন, এই উচ্চারণ শুধু মুখ ফসকে বেরিয়ে আসেনি, এর মূলে রয়েছে – হাজার বছরের প্রাচীন ইউরোপীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধের মানসিকতা।

## নাসরিন খন্দকার

*শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাসরিন খন্দকার সেমিনারে মূল প্রবন্ধকারের কাছে সরাসরি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

প্রথমতঃ প্রবন্ধকার বোরখা পরিহিতাদের উদার ও প্রগতিশীল বলে উল্লেখ করেছেন যারা জগন্নাথ হলের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছে। তাঁর এই বক্তব্য অংশতঃ ঠিক হলেও বোরখা পরিহিতারা যে অনৈসলামিক সে মতবাদও সমাজে প্রচলিত আছে। পাশাপাশি তাদের কর্মকাণ্ড সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশকেও প্রতিহত করে। এক্ষেত্রে ফরহাদ মজহারের ভাবনা বা বক্তব্য কি?

দ্বিতীয়তঃ তালেবানদের লড়াইকে শ্রেণীসংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় কিভাবে তা বোধগম্য নয়। কারণ তালেবানরা আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তা ঠিক, কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও তারা আমেরিকার স্বার্থেই কাজ করেছে। অপরদিকে যে কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করলেই তা শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হতে পারে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদের ভেতরেই এ লড়াই হতে পারে। নাসরিন খন্দকার এই বিষয়গুলোর উপর ফরহাদ মজহারের কাছে সুস্পষ্ট বক্তব্য চেয়েছেন।

## সাইফুর রহমান তপন

*কর্মী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল*

বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের বামপন্থীদলগুলো যে প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা পালন করছে তার প্রচার ও উৎসাহিত করণের ক্ষেত্রে মিডিয়ার গড়িমসি ও অনাগ্রহের কথা উল্লেখ করে প্রথমেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাইফুর রহমান তপন। তিনি বলেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে কিংবা তারও আগে থেকে বিভিন্ন স্থানে মার্কিনি যে আগ্রাসন, অন্তত এই একটি ইস্যুকে বামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। ১৫ নভেম্বরের হরতাল শুধু গ্যাস রপ্তানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না বরং এর সাথে জড়িত ছিল আফগানিস্তান ইস্যু এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ইস্যু। এই বিষয়টি আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে স্থান না পেলেও মৌলভী সাহেবরা যে মিছিল বের করেন তা তাঁরা ফলাও করে প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে বামপন্থীদের বিষয়ে মিডিয়া কিছুটা বিভ্রান্ত বলে তিনি মনে করেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে মৌলবাদী ও বামপন্থীদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মৌলবাদীরা আজ ইসলাম আক্রান্ত বলে মনে করছে বলেই এর বিরোধিতা করছে। অথচ কলম্বিয়াতে সাধারণ জনগণের ওপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চলছে, যুগোস্লাভিয়ায় যে বোমা হামলা হয়েছে তার কোনটার বিরুদ্ধেই মৌলবাদীরা প্রতিবাদ জানায়নি। আর বামপন্থীরা আজ যেমন আফগানিস্তানের জনগণের পক্ষে, তেমনি ছিল যুগোস্লাভিয়ার মিলোসেভিচের পক্ষে, আমেরিকার বিপক্ষে। প্রকৃতপক্ষে যে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের লক্ষ্যে আজ তালেবানদের নামে আফগানিস্তানের জনগণের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, একই লক্ষ্যে সেদিনও মিলোসেভিচের নামে যুগোস্লাভিয়ার মুসলমানদের ওপরও আক্রমণ হয়েছে।

সাইফুর রহমান মনে করেন, বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মার্কিন সরকার কর্তৃক পরিচালিত আগ্রাসী হামলাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তা না হলে, মূল সংগ্রামের গুরুত্ব অনুভব করা সম্ভব হবে না। নিজেদের কখনো মনে হবে মিলোসেভিচের পক্ষে, কখনো তালেবানদের পক্ষে। মূল যে সংগ্রাম তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং ক্রুসেডের নামে, জেহাদের নামে, খ্রিস্টান বনাম মুসলমান, হিন্দু বনাম মুসলমান এইসব দ্বিধাবিভক্তি তৈরি করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদেরই জয় হবে।

## আখতার সোবহান খান মাসরুর

*গবেষক*

ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্য এবং তার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলার যে মতাদর্শ, তার তীব্র সমালোচনা করেছেন আখতার সোবহান মাসরুর। কারণ তাহলে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ এশিয়ার অনেক দেশের মধ্যেই ঐক্য হবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না। তিনি মনে করেন, ধর্ম মানুষের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে না বরং এক ধরনের ডিসইন্টিগ্রেশন তৈরি করে। এক্ষেত্রে ইসলামকে ইডিওলজিক্যাল প্রিন্সিপাল, না ইন্সট্রুমেন্টালী দেখা হচ্ছে, তিনি তা সেমিনারের বক্তাদের নিকট জানতে চান।

সেমিনারের শিরোনামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আখতার সোবহান মাসরুর বলেন, আজকের সেমিনারে "ক্রুসেড; জেহাদ, শ্রেণীসংগ্রাম" এই শব্দগুলোর অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবেই ইসলামের সংগ্রাম এবং মেহনতি মানুষের সংগ্রামের মধ্যে মতাদর্শে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই সেই বিভাজনকে মুছে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলা করার ভাবনা কতটা যৌক্তিক হবে, তা ভেবে দেখার জন্য তিনি সকলের নিকট আহ্বান জানান।

## ফরিদা আখতার

*নারীনেত্রী, উবিনীগ, ঢাকা*

মুক্ত আলোচনার পরবর্তী বক্তা ছিলেন ফরিদা আখতার। ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতি সমর্থনকারী বক্তার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। তিনি বলেন, আফগানিস্তানে হামলার মধ্য দিয়ে আমেরিকা যত জন না তালেবান হত্যা করেছে তার থেকে অনেক বেশি হত্যা করেছে নারী, শিশু তথা সাধারণ মানুষকে। শুধু আফগানিস্তানে নয়, মার্কিন অবরোধের কারণে ইরাকে এ পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় দু'লক্ষ শিশু। সন্ত্রাস, তালেবান – এই জাতীয় ইস্যু তৈরি করে মার্কিনি প্রচার মাধ্যম যেভাবে খবর ছড়াচ্ছে আমরা বিষয়গুলোকে সেভাবেই গ্রহণ করছি। তলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি না।

## ফিরোজ আহমেদ

*কর্মী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন*

সেমিনারের নির্ধারিত বক্তা সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্যের সূত্র ধরে বক্তব্য রেখেছেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ফিরোজ আহমেদ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আন্দোলনগুলোর মূলে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হলো ঔপনিবেশিক শোষণ। শোষণ কখন "জেহাদ" হয় আর কখন তা সচেতন শ্রেণীসংগ্রামে রূপ নেয় তার মধ্যে খুব স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একটি জনগোষ্ঠী বা শ্রেণী তখনই ধর্মের আশ্রয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে যখন তার ক্ষমতা দখলের আকাঙ্খা থাকে কিন্তু মতাদর্শিকভাবে সে তার যোগ্য হয়ে ওঠে না। কাজেই আজকের দিনে যদি শ্রেণীসংগ্রামের স্থলে জেহাদের কথা বলা হয় তখন বিপ্লবের সত্যিকার যে ভাষা তা আড়াল হয়ে যায়। পাশাপাশি মেসবাহ কামালের ধর্মনিরপেক্ষতার মন্তব্যের সাথেও তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ ঔপনিবেশিক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা একটি খুবই অস্পষ্ট বিষয় যার মধ্যে কোন পরিচ্ছন্নতা থাকে না।

সেমিনারে ইসলামী শাসনতন্ত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে ফিরোজ আহমেদ বলেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র কখনোই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনের পক্ষে যাবে না, নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের যে আন্দোলন হচ্ছে তার পক্ষেও যাবে না। তারা শুধু তাই দেখে – যেখানে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নির্যাতন করে, হিন্দুরা মুসলমানদের নির্যাতন করে। পুঁজিপতিরা যে গরীব, নিপীড়িতকে শোষণ করে তা তাদের চোখের আড়ালেই থেকে যায়। তিনি বলেন, বামপন্থী দলগুলো সব সময়ই রাজনৈতিক ইসলামের বিপক্ষে। কিন্তু কখনোই একজন ঈমানদারের বিপক্ষে নয়। কারণ একজন ঈমানদার সচেতন ভাবে হোক বা না হোক আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া ধরতে পারেন। রাজনৈতিক ইসলামের অসম্পূর্ণতা আর সাম্রাজ্যবাদের চাহিদা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ

করে। মূল প্রতিপাদ্যের সাথে দ্বিমত করে বলেন, ক্রুসেড হিসেবে এই আগ্রাসনকে চিহ্নিত করার অর্থ পুঁজিবাদী সভ্যতাকে খ্রিস্টান সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আড়াল হয় এবং একই সাথে জনগণের ধর্ম নির্বিশেষে শোষিত হবার বিষয়টি আড়াল হয়ে তার ধর্মীয় পরিচয়টিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আগ্রাসনকারীদের জন্যও এই পরিচয় আড়াল হয়ে যাবার বিষয়টি সুবিধাজনক, সভ্যতার দ্বন্দ্ব হিসেবেই এই ঘটনাকে চালিয়ে দিতে পারাটা আগ্রাসনের একটি কৌশল।

## মনোজ মিশ্র জয়ন্ত

*ছাত্র, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ফরহাদ মজহারের নিকট সরাসরি প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু করেন জয়ন্ত। জনগণের কাছে ধর্মের ভাষায় কথা বলতে হবে – এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, জনগণ এক ধরনের ফলস কনসাসনেসে আক্রান্ত এবং এটা অবশ্যই ভাঙ্গতে হবে। ধর্মের ভাষায় কথা বলতে হলে তা দু'ভাবে করা যায়। প্রথমতঃ ধর্মের কথা হৃদয়ঙ্গম করে অর্থাৎ ধর্মের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মানুষের কাছে যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ ধর্মের বাণী নিজে গ্রহণ না করেও শুধুমাত্র মানুষকে কাছে টানার জন্য সে ভাষায় কথা বলা যায়। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হঠকারীতার নামান্তর। প্রথম পদক্ষেপের ক্ষেত্রে বলা যায়, ধর্ম পরজাগতিক সুখের কথা বলে। কাজেই পরজাগতিক চিন্তায় যারা মশগুল তাদের ইহজাগতিক চেতনা-জাগানো অসম্ভব। ফরহাদ মজহারের 'আয়না দিয়ে বুশের বক্তব্য দেখতে হবে' এই বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি অভিযোগ করেন, ফরহাদ মজহার পক্ষপাতিত্বে আক্রান্ত। কেননা, যদি আয়না দিয়েই দেখতে হয় তবে যুগপৎ বুশ এবং লাদেন উভয়ের বক্তব্যকেই আয়না দিয়ে দেখতে হবে। 'এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়' বুশের এ বক্তব্যকে যদি আয়না দিয়ে দেখে বিপরীত অর্থটা গ্রহণ করা হয় তবে লাদেনের 'এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এই বক্তব্যটিকেও একই পন্থায় দেখে তার বিপরীত অর্থটাই গ্রহণ করা উচিত।

## রাজীব সরকার

*ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে মৌলবাদীদের সাথে জোট বাঁধার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজীব সরকার। মৌলবাদীরা আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এটা ঠিক। কিন্তু তারা আদৌ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। আফগানিস্তানে মানুষ মারা যাচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে মানবতা। কিন্তু মৌলবাদীদের কাছে মূল বিষয় হচ্ছে সেখানে মুসলমান মারা যাচ্ছে – এই দৃষ্টিভঙ্গিরই সমালোচনা করেছেন রাজীব সরকার। কারণ মানবতার জন্য সুদূর আমেরিকায় যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন

হচ্ছে সেই উদাহরণই যথেষ্ট। তিনি বলেন, মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ আমরা যাই বলি না কেন, সবার আগে আমাদের যে পাঠটুকু নিতে হবে তা হলো মানবিকতার পাঠ।

## ফারুক ওয়াসিফ

*কর্মী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন*

ফারুক ওয়াসিফ মনে করেন "এখানে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে মনে হয় ক্রুসেড, জেহাদ আর শ্রেণীসংগ্রাম যেন স্থির একটি বিষয়। অতীতে যেমন ছিল আজকেও তেমনি কায়দায় চলছে এবং একই ভাষায় তার প্রকাশ হচ্ছে। মধ্যযুগে ক্রুসেডের মূল প্রণোদনা ছিল ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তারের তাগিদ এবং তার মাধ্যমে সামন্তীয় ব্যবস্থার সংকটকে ঢাকা।"

"বুশ ক্রুসেডের ভাষায় কথা বলছেন, এটা কোন অসতর্ক ব্যাপার নয়। বরং খুব সচেতনভাবেই এটা করা হয়েছে। যাতে মুসলমান জনগোষ্ঠী জবাবে জেহাদের ভাষায় কথা বলে। এটা একটা ফাঁদ।"

"নিপীড়িতের ইসলাম আর শাসকের ইসলাম কখনোই এক থাকেনি। নিপীড়িত প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে তার শরীরকে পায়, তার অভিজ্ঞতাকে পায়। অভিজ্ঞতার একটা রূপ হিসেবে ধর্ম, মতাদর্শকেও পায়। এখানে শাসকের ধর্ম তাত্ত্বিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্থাৎ শরীয়ত ভিত্তিক। নিপীড়িত মানুষের বিরুদ্ধে এই শরিয়তকেই তারা দাঁড় করিয়ে দেয়। এই ইসলাম বরং স্থির। নিপীড়িতের ইসলাম কখনোই অপরিবর্তিত থাকেনি। তারা সব সময়ই শাসকের ধর্ম ও তার তত্ত্বজগতকে বদলে দিয়েছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু তাদের নিজেদের ভাষাও তৈরি হয়নি, অন্ততঃ শাসকের ভাবভঙ্গী ব্যবহার করে। ভাষা না থাকলেও তার অভ্যাস বিভিন্নভাবেই তারা প্রকাশ করে। একে ধরতে না পারা একটা সংকট। এখানেই সেই ধর্মীয় প্রয়োজন যিনি দ্বান্দ্বিক ঐক্যের মাধ্যমে নিপীড়িতের তত্ত্বনির্মাণের কাজকে এগিয়ে নেবেন।

শ্রেণীসংগ্রাম সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ জেহাদ কি সে রকম কিছু? জেহাদী মনোভাব বলতে যা বলা হচ্ছে, তার কতটুকু ধর্ম আর কতটুকু শ্রেণীসম্পৃক্ততা?

## ব্রাত্য রাইসু

*কবি ও সাংবাদিক, প্রথম আলো, ঢাকা*

সরাসরি সেমিনারের শিরোনামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ব্রাত্য রাইসু।

"আফগানিস্তানে পশ্চিমা আগ্রাসন ও আমাদের কর্তব্য বিষয়ে" – শীর্ষক শিরোনামে "আমাদের" বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? আলোচনার কয়েক স্থানেই মৌলবাদীদের সাথে একজোট হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার প্রসঙ্গ এসেছে। এক্ষেত্রে মৌলবাদীরা যদি বামপন্থীদের আন্দোলনে ডাকে তবে তারা যাবেন কি না?

না গেলে কেন যাবেন না? আফগানিস্তান বিষয়ে বামপন্থীরা কী কর্তব্য পালন করেছে বা করা উচিত বলে মনে করছে?

প্রশ্নগুলোর তাৎক্ষণিক জবাবও দর্শকসারি থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন – প্রথম প্রশ্নে "আমাদের" বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে তা দর্শক জবাব দিয়েছে "বামপন্থী" দল। একই সাথে আফগানিস্তান প্রসঙ্গে বামপন্থীদের কর্তব্য বিষয়ে দর্শক ১৫ নভেম্বরের হরতালের উল্লেখ করেন।

## সরকার আমিন

*কবি ও গবেষক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা*

বর্তমানে বাংলাদেশে গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ইস্যু উত্থাপন করেন সরকার আমিন। গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে বেকার হয়েছে ৪ লক্ষ নারী। জীবিকার তাগিদে অবশ্যম্ভাবী ভাবে তারা পরিণত হচ্ছে সামাজিক প্রতিবন্ধীতে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি অ্যান পিটার্সকে যখন প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি জবাব দেন 'সে বিষয়টি পরে দেখা যাবে'। সরকার আমিন মনে করেন যেহেতু বিষয়টির সাথে তেল ও গ্যাস জড়িত তাই মার্কিনীরা তেল-গ্যাসের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতেই আগ্রহী।

## জিয়াউদ্দিন

*এনজিও নেতা*

মুক্ত আলোচনার সর্বশেষ বক্তা ছিলেন জিয়া উদ্দিন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ মোল্লাতন্ত্রের সাথে মার্ক্সিজমের সহাবস্থানের ক্ষেত্র হয়তো আছে। কারণ ক্ষেত্র-বিশেষে মোল্লাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর মার্ক্সিজম তো বটেই। কিন্তু ইসলামের কিছু আদি সংকট আছে, তত্ত্বগতভাবে যার নিরসন আজো হয় নি। বিংশ শতকে বিক্ষিপ্ত কিছু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেসব সংকট নিরসনের ক্ষেত্র আজ প্রস্তুত হয়েছে। আর এই চিন্তা ইসলামী দেশগুলোর সর্বত্রই বিরাজ করছে। এই তাত্ত্বিক অবস্থানকেই বামপন্থীদের আজ মোকাবিলা করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

# পূর্ব মীমাংসা ॥ প্রবন্ধকারের উত্তর

## ফরহাদ মজহার

আমাদের সমাজে যে কোন ধরনের চিন্তার একটা বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা চেনার সমস্যা। যদি সে জেহাদের রূপে নিজেকে প্রকাশ করে, কী করে বুঝব এটা শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা না মোল্লাতন্ত্রের ভাষা? এই পদ্ধতিটি আমাদের জানতে হবে।

মোল্লাতন্ত্রের সাথে মার্ক্সবাদের ঐক্যের যে প্রস্তাব আমি করেছি বলে বলা হচ্ছে, এখানে আসলে সেকথা বলা হয়নি। এখানে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে। যদি মনে করা হয়, বর্তমানে আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের সাথে কোন প্রকার আঁতাতের জায়গা নেই – তো নেই। কিন্তু সেটা আমাদের আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের যে পূর্বানুমান এটা ভীতিকর,কারণ এটা জ্ঞানগত নয়। এটা ভাঙ্গা দরকার। ইসলামের সাথে আমাদের জ্ঞানগত এবং মতাদর্শিক যে বাধা তা কি আসলেই বাস্তব, না তা সরাসরি মোকাবিলা করার সাহস আমরা অর্জন করিনি। এটা আমাদের মোকাবিলা করে দেখাতে হবে যে, আমরা আদৌ সঠিক দিকে যাচ্ছি না আমরা ভুল করছি। এজন্য ইসলামী রাজনীতির লিফলেট, ভাষাতন্ত্র, গঠনতন্ত্র, ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। জানতে হবে কিভাবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো অন্য মতাদর্শ নিয়ে লড়াই করে। আর এ কারণেই সংলাপ দরকার। তা না করলে আমরা পিছিয়ে যাব।

রেহনুমা আহমেদের সমালোচনার সাথে আমি একমত। একথা ঠিক যে, শুধুমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের জায়গায় দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে বোঝার যে প্রথাগত চিন্তা তা নতুন করে ভাবতে হবে। দ্বিতীয়তঃ লিঙ্গীয় সম্পর্ক বা পরিবেশগত সমস্যার সম্পর্ক নিয়ে যে প্রশ্ন তাও সত্য। তবে আজকের মূল আলোচনা সে বিষয়কে কেন্দ্র করে নয় বলেই হয়তো বিষয়গুলো অনুচ্চারিত থেকেছে।

আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আমরা তেল দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে বোঝার চেষ্টা করব না। সাধারণত শ্রেণীসংগ্রামের কথা যখন আমরা বলি তখন পণ্যের বিনিময়ের জায়গা থেকেই বলি, পুঁজিতন্ত্র আমাদের যে বস্তুগত রূপান্তর ঘটাচ্ছে তার ওপর আলোচনাটা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ফলে আজকে

শ্রেণীসংগ্রামের ভাষাটা কেন জেহাদের রূপ পরিগ্রহ করছে তা বোঝাতে গিয়ে তেলের প্রসঙ্গ এসেছে। কারণ মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তেলের প্রাচুর্য আছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঐ দেশগুলো থেকে তেল আহরণের জন্য লড়াই চালাচ্ছে। ফলে ইসলাম প্রধান দেশ বনাম পশ্চিমা দেশে দখলদারিত্বের একটা সংগ্রাম চলছে। আর এজন্যই ভাষাটা ক্রুসেডের ভাষা এবং জেহাদের ভাষা হচ্ছে।

আজকে জর্জ বুশের মুখ থেকে ক্রুসেডের কথা বের হয় – এটা আকস্মিক কিনা সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হচ্ছে। না, এটি শ্রেণীসংগ্রামের ভাষা। যে শোষণ করে সে ক্রুসেডের ভাষায় কথা বলছে আর যারা শ্রেণীসংগ্রাম করে তাদের কাছে অন্য কোন মতাদর্শ হাজির নেই বলে সে জেহাদের ভাষায় কথা বলে। মোল্লাতন্ত্রের চেয়েও নতুন কোন গ্রহণযোগ্য মতাদর্শ দিলে সে তা গ্রহণ করবে। তবে কি ভাষায় ডিসকোর্স তৈরি হয়, ভাষা তৈরি হয় এবং সেই ভাষা তৈরির ক্ষেত্রে আদৌ কোন সংগ্রাম সম্ভব কিনা আর একটা পথ অনুসন্ধান করাই ছিল আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়।

বন্ধুদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি আপনারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে চান তবে জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে। জনগণ মার্ক্স, লেনিনের কথা বুঝে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে এবং সে জায়গায় আমাদের যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বিমূর্ত ও মূর্তের মধ্যে একটা তফাৎ বলতে হবে। শ্রেণীসংগ্রাম একটা বিমূর্ত চিন্তা, এটা বোঝাবার এবং ইতিহাসকে বিবেচনা করার, পর্যালোচনা করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা – যা প্রগতিশীলদের কাছে, বিপ্লবী রাজনীতিবিদদের কাছে নেগোশিয়েবল নয়।

শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক উপযোগিতা এখনও শেষ হয়ে যায় নি। তবে তা উপস্থাপন করতে হবে এবং নিপীড়িত শ্রেণীকে বোঝাতে হবে যে, তার লড়াই আসলে শ্রেণীসংগ্রামের অংশ। শুধুমাত্র দৈব চিন্তা, দৈব নির্দেশ দ্বারা মানুষের মুক্তি আসবে না।

বাংলাদেশে এখনও ধর্ম এবং রাষ্ট্র আলোচনা যথেষ্ট হয় নি। ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি রাজনৈতিক ক্যাটেগরি, সামাজিক ক্যাটেগরি নয়। ধর্ম সমাজের সংস্কৃতি, ভাব, চিন্তা-চেতনার সাথে জড়িয়ে থাকে। তাই কার্ল মার্ক্স কখনোই বিশ্বাস করতেন না ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ বলে কিছু আছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে কিভাবে দেখব, অ-সাম্প্রদায়িকতাকে কিভাবে মোকাবিলা করব তা বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত আলোচনা এখনও পর্যন্ত হয়নি।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক ইসলাম, রাজনৈতিক খ্রিস্টান হাজির হচ্ছে যার মোকাবিলা করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে, মতাদর্শকে মতাদর্শ দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে। ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে চিন্তা-চেতনার মিল না হলে তার সাথে একটা মতাদর্শিক লড়াই আমাদের চালাতে হবে। এজন্য জ্ঞানের উৎস থেকে মতাদর্শের উৎস ধার নেয়া যেতে পারে। আর এর মধ্য দিয়েই সমাজে সত্যিকার বিপ্লবের রাজনৈতিক ধারা, মতাদর্শ আমরা ধরে নিতে পারব।

# উত্তর মীমাংসা ॥ সভাপতির ভাষণ

আহমেদ কামাল*

সবশেষে সেমিনারের সভাপতি আহমেদ কামাল সমাপনী বক্তব্যে নিজেকে সেমিনারের সবচেয়ে নিপীড়িত ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আমার কোন স্বাধীনতা ছিল না ইচ্ছেমত বলে যাওয়ার। আমাকে থাকতেই হতো। আমি নিজে মনে করি, আলোচনা খুবই প্রাণবন্ত হয়েছে। ফরহাদ মজহার একটি খুবই সুচিন্তিত প্রবন্ধ এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং এই নিয়ে বিতর্কেরও সূত্রপাত হয়েছে। এই বিতর্কের যে সম্ভাবনা তা আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজনীতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করবে। যদি এই বিতর্কটা আমরা চালাতে মনস্থ করি তাহলে আমি আশা করব এ বক্তব্যের বিপক্ষে যারা মতামত দিতে রাজী তারা যদি তা লিখিত দেন তবে তা নিয়ে আমরা আরো একটি সভার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আলোচনায় বসতে পারি। এবং আমি মনে করি এই গ্লোবাল কনটেক্সটে এই বিতর্কটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আজকের সভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নির্দিষ্ট মতানুসারীর বাইরের কোন মতানুসারীর উপস্থিতি। এই প্রথম আবদুল কাদের সাহেবকে পাশে বসিয়ে আমাদেরকে একটা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম এবং এটি একটি মাইলস্টোন যে, যাকে আমরা ভিন্ন মতাবলম্বী বলে মনে করি তাকে সাথে নিয়ে আলোচনায় বসা। এটি একটি পরিবর্তন এবং সম্ভবত এই পরিবর্তন আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজের বিনির্মাণেরই কিছু লক্ষণ।

আমরা বিতর্কের সুযোগ তৈরি করতে চাই। কারণ এই সমাজের দুর্দশার অনেকখানি কারণ হলো এই যে, আমরা বিতর্ক করি না। আমি এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি – ষাটের দশকে যখন ৬ দফা দাবীনামা দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা যারা চীনপন্থী ছাত্র সংগঠন করি তারা এটা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। আমাদের নেতাকে আমরা প্রশ্ন করলাম যে, ৬ দফার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে। আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল এটি একটি ইনকমপ্লিট চার্টার অব ডিমান্ড। একে আরো

---

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

র‍্যাডিক্যালাইজড করা যায় কিনা এবং এর একটা সমালোচনা বের করা যায় কিনা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে যার একটা র‍্যাডিক্যাল পটেনশিয়াল থাকতে পারে – আমরা তাই নেতার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম। এই পরিস্থিতিতে একদিন আমাদেরকে ৬ দফার সমালোচনা বিষয়ক একটি বই সরবরাহ করা হল। এটি করেছিল তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামীর করা সমালোচনা আমাদেরকে পড়তে দেয়া হচ্ছিল দেখে আমরা অবাক হলাম। কিন্তু আমাদের বলা হল যে, কে করেছে তা দেখার দরকার নেই, সমালোচনাগুলো দেখ এবং এগুলো ভালোই করেছে। সেদিনও আমরা কোন বিতর্কে যেতে পারিনি। আমাদেরকে বলা হতো এবং আমরা তৎকালীন ছাত্র সংগঠনের যেগুলো কর্তব্য তা পালন করতাম। পরবর্তীকালে যারা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তারাও হয়তো তাই করেন। তারা যে খুব ভালো কাজ করেন নি তার প্রমাণ হচ্ছে ৫০ বছরে বামপন্থীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সেই গবেষণা মেসবাহ কামাল করবেন বলে আশা করি। তবে আলোচনা ও বিতর্ক যদি চলে এবং বামদলগুলো সম্পর্কে অন্যদের কী ধারণা তা যদি আলোচিত হয় তাহলে বোধ হয় বামপন্থী দলগুলো আরেকবার নিজেদের দিকে তাকাবার চেষ্টা করতে পারে। এটা আমার একটা ধারণা। এ ধারণা ভুলও হতে পারে।

আমি কিছুদিন আগে ভিয়েতনামে গিয়েছিলাম। আমার খুব শখ ছিল যে কোন একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখার। ভিয়েতনামে যাওয়ার পরে সায়গনে ওদের মিউজিয়ামে যুদ্ধ দিনের প্রচুর স্মৃতি রক্ষিত আছে দেখতে পেলাম। সবকিছুর সাথে সেখানে প্রচুর বিচ্ছিন্ন মমি, এবং তাদের সংগ্রামের অনেক ছবিও রক্ষিত আছে দেখতে পেলাম। ছাত্রজীবনে আমরা ভিয়েতনামের সংগ্রামের পাশে ছিলাম এবং সেই সংগ্রামকে আমরা গভীরভাবে ফলো করেছি। (মাঝে মাঝে আমরা তাদের সম্পদ পুড়িয়ে দেয়ার ছবি দেখতাম পত্রিকায় এবং ভিয়েতনামী পার্টির সাথে তাদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাও আমরা জানতাম)। এবার সায়গনে গিয়ে সে সম্পর্কে আরও বেশি জানার সুযোগ হয়েছে যে কিভাবে সম্পর্কটা কাজ করেছে।

ল্যাটিন আমেরিকায় তো লিবারেশন জীয়লজি বলে ক্যাথলিকদের মধ্যে একটা দার্শনিক অবস্থান আছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে ক্যাথলিকদেরও একটা ওয়ার্কিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল, সংগ্রামে একে অপরকে সহযোগিতার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। আমি চিন্তা করছিলাম যে, কোন মুসলিম দেশে এ ধরনের কোন সহযোগিতা হয়েছে কিনা খুঁজে পেতে। এক্ষেত্রে আমি ইন্দোনেশিয়ার কথা স্মরণ করলাম। সেখানে সুকর্ণর নেতৃত্বে যখন জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হচ্ছিল তখন এ ধরনের একটা ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে সেটা তত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না।

আজকে আমাদের একটু খোঁজ করা দরকার যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে যারা ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গড়তে চায় আর যারা মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে সমাজ গড়তে

চায় তাঁরা কাছাকাছি আসতে পারে কি না? এখানে বাংলাদেশের মার্ক্সিস্টরা অবদান রাখতে পারেন। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা এই সমাজটাকে, সমাজের মানুষকে, সমাজের চেতনা, চৈতন্য, ঐতিহ্যের ইতিহাসকে ভাল করে বোঝার চেষ্টা করিনি। এজন্যই আমরা একইভাবে এগোচ্ছি, একই ভুল করে যাচ্ছি, একই সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে যাচ্ছি এবং একসময় দল ত্যাগ করে অন্য দলে আশ্রয় নিচ্ছি। অথচ এই ব্যর্থতার ইতিহাসও আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি।

আজ আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত আমরা যা করছি এবং যা করেছি সে সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন তোলা। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা সবাই মার্কিন আগ্রাসনে অংশ নিয়েছি কিন্তু প্রশ্ন তুলেছি খুব কম।

১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন হামলার মধ্য দিয়ে যে ব্যাপারটি ঘটেছে তা হলো, সত্যের সন্ধান করার অধিকার মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। সত্য এখন প্রতিষ্ঠানের বিষয় হয়েছে। এখন টেলিভিশন আপনাকে সত্য বলবে, পত্রিকা বলবে, সরকার বলবে, পার্টি বলবে। কিন্তু সত্যের জন্য স্বাধীন ভাবে অনুসন্ধান করার যে সুযোগ, স্বাধীনতা মানুষের ছিল তা ১১ সেপ্টেম্বরের পর হারিয়ে গেছে। আমাদের লড়াইয়ে সেই সত্য অনুসন্ধানেরই স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং সত্য অনুসন্ধানের অধিকার রক্ষায় যে লড়াই তাই আমাদের করতে হবে।

একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই আছে। সেই লড়াইয়ে নানা দিক থেকে, নানা স্রোত থেকে মানুষ অবদান রাখছে, নানা ভাষায় সেই লড়াইয়ের ইতিহাস লেখা হচ্ছে – এটাই মানব সভ্যতার ডেস্টিনি এবং তা চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে না পারব।

# 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ক নিয়ে অধিপতির ভাবনাজাল ॥ চিঠি

**খালেদা খাতুন, সায়দিয়া গুলরুখ**
**নাসিম আখতার হোসাইন এবং মানস চৌধুরী**

আমাদের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট হচ্ছে: অতি সাম্প্রতিক কালে ঢাকার চিন্তাস্রোতে 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' নামক সংঘের সংযোজন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই সংঘ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান। "ক্রুসেড, জেহাদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম" শিরোনামে এই আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ নভেম্বর ২০০১-এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ মিলনায়তনে, সকাল ১০টায়। দুটো পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য।

প্রথম বক্তব্যটি হচ্ছে শিরোনামে লক্ষ্যণীয় পূর্বানুমান বিষয়ে। শ্রেণীসংগ্রাম ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। এর মাধ্যমে অপরাপর বৈষম্য এবং সংগ্রাম নিয়ে প্রস্তাবকের ভাবনা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় বলে আমাদের বিবেচনা। এই প্রসঙ্গেই একজন আলোচক (রেহনুমা আহমেদ) প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, লিঙ্গীয় সম্পর্কের মত গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা স্থান না দিয়ে বর্তমান আলোচনা গড়ে তোলা যথার্থ কিনা। তিনি যুক্তি দেন, এবারের যুদ্ধে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলাকে যুক্তিসিদ্ধ করতে 'নারী প্রসঙ্গ' ছিল তুরুপের তাস। কারণ, আফগানিস্তানের তালিবান শাসন নারীদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে – এই বচন তালিবান উৎখাতের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে খাড়া করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার হামলা-শরিকেরা। কিন্তু, মুক্ত-আলোচনার বক্তাগণ সমেত সেদিনের আলোচনার একাধিক বক্তা অনুধাবন করেছেন এবং সে মত যুক্তি দিয়েছেন যে, 'শ্রেণী'র ধারণা অপরাপর বৈষম্য ও বৈষম্য বিরোধী সংগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁর সুযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। বরং সমকালীন দুনিয়ার আলাপ-আলোচনা-ডিসকোর্সে বিভিন্ন লড়াই কিভাবে প্রকাশিত হয় তা বিবেচনা করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে লিঙ্গীয়, জাতিগত এবং নরবর্ণগত (রেসিয়াল) বিভাজন নিয়ে সতর্ক হবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে চাচ্ছি আমরা। কোন একটি শব্দ বা পদের অর্থ

কালোত্তীর্ণ নয় এবং পদটির অনুশীলন অর্থকে নির্মাণ করে। সেক্ষেত্রে এ প্রশ্নটিও দেখা দিতে পারে যে, শ্রেণীসংগ্রাম ধারণাটি ঔপনিবেশিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ কিনা। আমাদের ধারণা: শিরোনামে শ্রেণীসংগ্রাম প্রত্যয়টির সংযোজন – শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্রীয় এবং সর্বাত্মক দ্বন্দ্ব হিসেবে স্থাপন করে – প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ বাহাসের পরিসীমা সংকুচিত করেছে। কতকগুলো সামাজিক সম্পর্ক এতে হালকা হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে লিঙ্গ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে। লেখক হিসেবে এবং চিন্তক হিসেবে আহমদ ছফার গুরুত্ব অনুসন্ধান একটি জরুরি বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ। আহমদ ছফার পাঠপদ্ধতি দাঁড় করানো 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'র প্রাথমিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করি আমরা। সামাজিক বৈষম্যকে তিনি কিভাবে উপলব্ধি করেছেন সেটা প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা। এখানে লিঙ্গীয় সম্পর্কের কথাই হচ্ছে শুধু। প্রসঙ্গটি আমরা উল্লেখ করছি অবশ্যই পূর্বের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আমরা মনে করি, লিঙ্গীয় প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক এই সংঘটির ঘোষণা থাকা দরকার। সেটার কারণ খোদ আহমদ ছফার লেখালেখি। তাঁর শত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি নারী বিদ্বেষী হিসেবে প্রতিভাত, তাঁর সাহিত্যে নারীর উপস্থাপন সমস্যাজনক (উদাহরণ হিসেবে দেখুন আহমদ ছফা, *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী*, ১৯৯৮ ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স)। সেদিনের আলোচনার শিরোনামে, এবং একজন আলোচক বাদে খোদ প্রবন্ধকার, বাদবাকি আলোচক এবং সভাপতির বক্তব্যে শ্রেণীসংগ্রাম লিঙ্গ-নিরপেক্ষ (মানে পুরুষালি, যেহেতু পুরুষ হচ্ছে আদর্শমতি) হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে আমাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে, আহমদ ছফাকে অনুসরণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রসভার তৎপরতা লিঙ্গীয় সম্পর্ককে লঘু করে ফেলবে কিনা।

আমাদের সবিনয় বক্তব্য হচ্ছে: আহমদ ছফাকে কিংবা আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে লাঘব করা কোনমতেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আলাপ ও বাহাস জারি রাখবার যে আগ্রহ উদ্যোক্তরা দেখিয়েছেন তার শ্রদ্ধা রেখেই আমাদের এই মন্তব্য। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে আরও আলাপ-বাহাস করতে আমাদের বিনীত সম্মতি আছে।

*ধানমণ্ডি, ২৪ নভেম্বর ২০০১*

# প ত্র সূ চি

ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম ৭
ফরহাদ মজহার

আফগানিস্তানে ইঙ্গ মার্কিন হামলা : জালেম ও মজলুম ৩১
আহমেদ আবদুল কাদের

'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম' প্রসঙ্গে ৩৭
রেহনুমা আহমেদ

না ক্রুসেড ও না জেহাদ ৪১
সলিমুল্লাহ খান

উপস্থিত বাদ প্রতিবাদ ৫০
মেসবাহ কামাল ও অন্য ১৩ জন

পূর্ব মীমাংসা ॥ প্রবন্ধকারের উত্তর ৫৮
ফরহাদ মজহার

উত্তর মীমাংসা ॥ সভাপতির ভাষণ ৬০
আহমেদ কামাল

'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ক
নিয়ে অধিপতির ভাবনাজাল ॥ চিঠি ৬৩
খালেদা খাতুন ও অন্য ৩ জন

আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভার পক্ষে ১৬/এ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলা মটর, ঢাকা ১০০০ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ফোন : ০১৮ ২৯ ৬৭ ৮৭। দাম : ৪০ টাকা